৭৭ ১
আল মাহমুদ

কিশোরকণ্ঠ

কিশোরকণ্ঠ পড়বো জীবনটাকে গড়বো
ফুলের মত ফুটব মোরা জ্ঞানের আলোয় জ্বলবো

আমরা হব ভোর বিহানে পাখির কলরব
জাগিয়ে দেব ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলো সব
যে জানে না জ্ঞান রাখে না
তার মত না হব
তাকেও টেনে তুলবো

বড় হতে লাগে সবার বড় হৃদয় মন
বড় হৃদয় মন গড়ে দেয় শুধু অধ্যয়ন
অধ্যয়নে অন্ধ মনে
পায় যে আলোক পূর্ব
সূর্য আলোক পূর্ণ

শূন্য হৃদয় পূর্ণতা পায় বইয়ের মাঝে ভাই
যদি সে বই সত্য পথের সঠিক দিশা দেয়
যে জানে না জ্ঞান রাখে না
তার মত না হব
তাকেও টেনে তুলবো

www.pathagar.org

৭৭

আল মাহমুদ

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

নির্বাহী সম্পাদক
নিজামুল হক নাঈম

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
হামিদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
জুবায়ের হুসাইন
আনিসুর রহমান
তোফাজ্জল হুসাইন

গ্রাফিকস
মনিরুজ্জামান মনির

সম্পাদনা সহযোগী
মাজহারুল ইসলাম
জাফর ফিরোজ

প্রকাশনায়
নতুন কিশোরকণ্ঠ

প্রকাশকাল
১১ জুলাই ২০১২

শুভেচ্ছা মূল্য
১৫০ টাকা

কৃতজ্ঞতা
আবদুল জব্বার
আলহাজ্ব শাহাবুদ্দিন মুন্সী

www.pathagar.org

স ম্পা দ কী য়

৭৭-এ কবি আল মাহমুদ

পঞ্চাশের কবি আল মাহমুদ। আমাদের প্রিয় কবি, প্রাণের কবি। বাংলা সাহিত্যকে উর্বর ও সমৃদ্ধ করেছেন যাঁরা, কবি আল মাহমুদ তাঁদের ভেতর অন্যতম। বিশেষ করে বাংলা কবিতার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান অনেক বেশি।

কবি আল মাহমুদের সমসাময়িক বহু কবি-সাহিত্যিক আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। তাঁরাও ছিলেন আমাদের অনেক কাছের মানুষ, আপনজন। তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আর কবি আল মাহমুদের প্রতি রইলো আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভ কামনা।

কবি আল মাহমুদ সাহিত্যের পথে হেঁটেছেন গোটা জীবন। বলতে গেলে একটি জীবনই তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের জন্য। সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা ছাড়া এমনটি ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের পথটি বড় অমসৃণ ও কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে আসেন অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন খুব কমই। সাহিত্যে সফলতার চূড়া স্পর্শ করা এক কঠিন ব্যাপার। শ-ঘার বিষয় হলো কবি আল মাহমুদ সফলতার সেই দুর্গম শিখর স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

কবি আল মাহমুদ পাঠকের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত। বাংলাদেশের সব ক'টি জাতীয়সহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও তাঁর সাহিত্যের উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। এটা বাংলা সাহিত্যসহ আমাদের জন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বয়সের ভারে কবি আল মাহমুদ এখন অনেকটাই দুর্বল। তবুও এই বয়সেও তিনি সাহিত্যের ব্যাপারে সমান আবেগী ও চলমান। এটা কম কথা নয়। এখনও তাঁকে লিখতে দেখা যায়, দেখা যায় বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠানেও। এইতো সেদিন– ৯ জুন, ২০১২ তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত কিশোরকণ্ঠ পাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ অনুষ্ঠান শেষ করেই তিনি আবার রওনা হলেন রংপুরের উদ্দেশে, একটি সাহিত্য সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। এভাবেই তিনি এখনও সাহিত্যে ও সাহিত্য-অনুষঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত ও ব্যস্ত রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যকে করে যাচ্ছেন তিনি এভাবেই অশেষ ঋণী। তাঁর এই অবদানের কথা ভুলবার নয় কখনো।

এবার ১১ জুলাই, ২০১২ তে কবি আল মাহমুদ পা রাখলেন ৭৭ বছরে। সাহিত্যের পথে তাঁর এই অভিযাত্রায় তিনি রেখে গেছেন এক অমলিন স্বর্ণছাপ। এখনও তিনি সাহিত্যের ব্যাপারে অক্লান্ত। কিশোরকণ্ঠ যখনই তাঁকে ডাক দিয়েছে, তখনই তিনি শত ব্যস্ততা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও উপস্থিত হয়েছেন। কিশোরকণ্ঠে লিখেছেন আনন্দচিত্তে। এখনও লিখছেন।

কিশোরকণ্ঠের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসার ঋণ অপ্রতিশোধ্য। ঋণ শোধের জন্য নয়, বরং ঋণ স্বীকারের জন্যই আমাদের এই আয়োজন–'৭৭-এ আল মাহমুদ'।

কামনা করি বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি রেখে যান আরও অশেষ অবদান। দোয়া করি কবি আল মাহমুদ আরও দীর্ঘজীবী হোন। সেই সাথে আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফিজ। ■

www.pathagar.org

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী	৫
কবির অনুভূতি	১২
কবি পরিচিতি	১৩
কবিকে নিয়ে	
গোলাম মোহাম্মদ	যেখানে তিনি অনন্য ১৬
জুবাইদা গুলশান আরা	আল মাহমুদ : কতটুকু জানি ১৮
আবদুল হাই শিকদার	আল মাহমুদ : আমাদের সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে ২০
মোশাররফ হোসেন খান	চার দশকের চেনা ২২
হামিদুল ইসলাম	মুগ্ধতার সুতোয় বোনা ২৪
শামীমা আক্তার বকুল	আব্বাকে যেমন দেখছি ২৫
জুবায়ের হুসাইন	চির সবুজের কবি ২৬
নিবেদিত কবিতা	২৮
আসাদ বিন হাফিজ	
জাকির আবু জাফর	
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	
রেদওয়ানুল হক	
সাইফ মাহদী	
জাফর ফিরোজ	
আবদুল বাতেন	
নিশাত তাসনীম স্বস্তী	
কিশোরকণ্ঠে আল মাহমুদ	৩১

www.pathagar.org

বাণী

চিরসবুজের কবি আল মাহমুদ। আমাদের জাতিসত্তার মূল সুর ফুটে ওঠে তাঁর লেখনির মধ্য দিয়ে। স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে তাঁর জুড়ি নেই। তরুণ সমাজ খুঁজে পায় আগামীর দিকনির্দেশনা। দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। কবি তাই শেষ বয়সে উপনীত হয়েও এখনও যেন টগবগে যুবক।

কবি আল মাহমুদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন কিশোরকণ্ঠ "৭৭-এ আল মাহমুদ" নামক স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে কিশোরকণ্ঠ। এজন্য এর কলাকুশলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান সংগঠক কবি আল মাহমুদের জন্মদিনে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রত্যাশা করছি সাথে সাথে আল্লাহপাকের কাছে মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাদের মাঝে আরো দীর্ঘদিন বিচরণ করতে পারেন।

আল্লাহ্ হাফেজ, বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

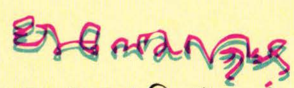

(বেগম খালেদা জিয়া)
বিরোধীদলীয় নেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
এবং
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

www.pathagar.org

বাণী

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী কবি আল মাহমুদ। নিঃসন্দেহে সমকালীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। মেধার ক্ষেত্রে যেমন জীবনের ক্ষেত্রেও বহুমাত্রিক। এ মানুষটি শুধু ছন্দের নান্দনীকতায় নয়, সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষেও সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠিত হননি। আমি সেই বিরল ভাগ্যবান তরুণদের একজন যে ১৯৭৪ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এ মহান কবির সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। বিষয়টি প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর এক চমৎকার চারিত্রিক সমন্বয় ফুটে ওঠে। কবি নজরুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে যেয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। আর আমাদের প্রিয় কবি আল মাহমুদ ১৯৭২-১৯৭৫ সালের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লেখনী চালাতে যেয়ে গ্রেফতার বরণ করেন।

আমার কাছে মনে হয় এদেশ সকল কিছু ছাপিয়েও মানবতাবাদী ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্ভাসিত এক বিশাল হৃদয়ের ক্যানভাসে তিনি বাংলাদেশের গণমানুষের অনুভূতিকে ধারণ করেছেন। আমি তাঁর এ জন্মদিনের উৎসবে হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মিনতি নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা করি-- কবির অফুরন্ত সৃষ্টি থেকে তিনি যেন আমাদের সহসায় বঞ্চিত না করেন।

(শফিউল আলম প্রধান)
চেয়ারম্যান
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)

www.pathagar.org

বাণী

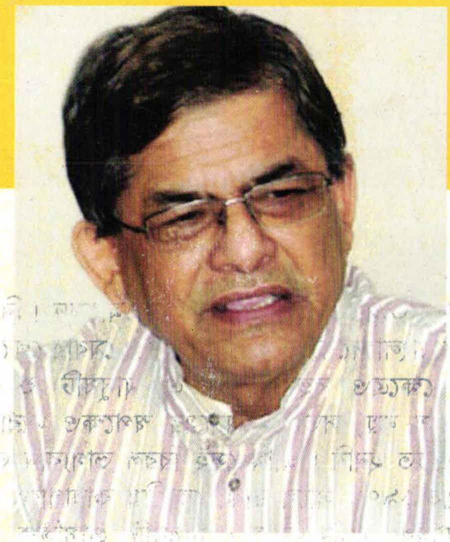

বর্তমানে বাংলা সাহিত্য তথা বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। চিরসবুজের কবি তিনি। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবিতে সোচ্চার তাঁর লেখনী। তরুণ ও যুবসমাজকে স্বপ্নচারী করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে কবির রচনা সম্ভার। জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েও আল মাহমুদ যেসব লেখা উপহার দিচ্ছেন তা আমাদেরকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করে। নতুন আশায় বুক বাঁধতে প্রেরণা জোগায়। অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দীক্ষা দেয়।

আমরা এই মহান কবিকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছি। তাই কিশোরকণ্ঠের এই আয়োজনে জাতির এই দায় কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।

কবির দীর্ঘায়ু, সুস্থতা ও জীবন-জাগানিয়া উদ্দীপনামূলক আরো লেখা কামনা করছি এবং কিশোরকণ্ঠের এই সাহসী ও সময়োপযোগী উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

(মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর)
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

www.pathagar.org

বাণী

আল মাহমুদ বাংলা ভাষার প্রধানতম আধুনিক কবিদের একজন। বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হয়েছে তাঁর হাতে। তিনি বাংলাদেশের মূলধারার কবিদের অন্যতম। নজরুল-ফররুখের পর তাঁর লেখনীতে উচ্চারিত হতে দেখা যায় সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মাণের দিকনির্দেশনা। ধ্বনিত হয় আগামীর সম্ভাবনার স্লোগানগুলো।

১১ জুলাই আমার এই প্রিয় কবির শুভ জন্মদিন। এ বছর ৭৭-এ পা দিচ্ছেন তিনি। বয়সের ভারে শরীরে দুর্বলতার কিছুটা ছোঁয়া লাগলেও মনে-প্রাণে এখনও তিনি চির কিশোর। তাঁর সাম্প্রতিককালের লেখাগুলো অধ্যয়ন করলে সেটাই প্রতীয়মান হয় স্পষ্টভাবে। কবিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মহান রবের কাছে কামনা করছি, তিনি এই মানবতাবাদী কবির হায়াতকে আরো বাড়িয়ে দিন। সুস্থতার সাথে জাতিকে পথ দেখাতে তাঁর লেখনী যেন সর্বদা সচল থাকে।

(মোঃ দেলাওয়ার হোসেন)
চেয়ারম্যান
সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ (সসাস)

www.pathagar.org

বাণী

স্বপ্নচারী কবি আল মাহমুদ। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। তরুণ ও যুবসমাজকে স্বপ্ন দেখাতে এবং নিজেকে ও দেশকে গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে কবির রচনাসম্ভার। জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েও আল মাহমুদ এখনও আমাদেরকে নতুন নতুন লেখা উপহার দিচ্ছেন।

কবি আল মাহমুদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন কিশোরকণ্ঠ '৭৭-এ আল মাহমুদ' নামক স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তার এই ৭৭তম জন্মদিনে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা।

কবির দীর্ঘায়ু, সুস্থতা ও জীবন-জাগানিয়া উদ্দীপনামূলক আরো লেখা কামনা করছি। আল্লাহ পাক তাকে সুস্থ রাখুন এবং দেশ ও জাতিকে আরো খেদমত করার তৌফিক দিন। আমিন।

(এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ)
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-২

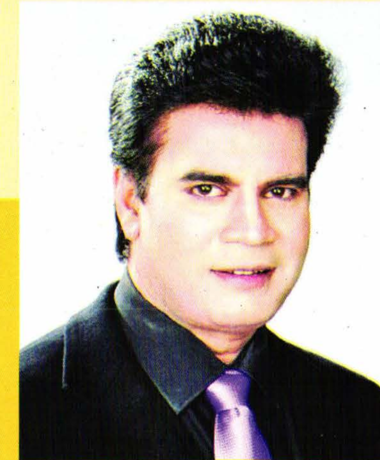

বাণী

বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। তাঁর সৃষ্টি জাতিকে সর্বদা স্বপ্ন দেখায়। এই সময়ে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্থতা কামনা করছি। তিনি দেশ ও মানুষের জন্য আরও লিখে যাবেন; কবির ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে আমার ও বাংলাদেশ ডিজিটাল ফিল্ম সোসাইটির পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

(ইলিয়াস কাঞ্চন)
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ডিজিটাল ফিল্ম সোসাইটি

www.pathagar.org

বাণী

উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের ৭৭তম জন্মদিনে মহান আল-াহর কাছে কবির সুস্বাস্থ্য এবং ঈমানী নেক সৃজনশীল আনন্দদায়ক হায়াত কামনা করছি। তৌহিদী চিন্তা-চিন্তনের কবি আল মাহমুদের বিপুল রচনা ভাণ্ডার জাতির মানসকে অনাবিল চিন্তার খোরাক জুগিয়ে চলেছে। আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁর রচনায় পাবে এক অনাবিল প্রেরণা, এ আমার নিখাদ বিশ্বাস। তিনি তাঁর কবিতায় যেমন বিচিত্র স্বাপ্নিক চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন তেমনি গদ্য রচনায়ও সমান উচ্চমার্গের বাস্তবতার প্রতিফলন স্থাপন করেছেন। তিনি যেমন স্বপ্ন-সমুদ্রের কবি তেমনি কঠিন বাস্তবতার সাহিত্যিক। গদ্য এবং পদ্য সকল রচনাতেই তিনি তাঁর অন্তর্লোকের চিন্তারাজ্যের যে প্রেমের সমুদ্র, আমাদের সমাজ-পৃথিবীর আরশিতে তার প্রতিফলন দেখিয়েছেন। কবি এখনো লিখে যাচ্ছেন, চোখের দৃষ্টি তাঁর ক্ষীণ হলেও অন্তর-জ্ঞানের তীক্ষ্ণ আলোর দৃষ্টিতে তিনি শক্তিমান চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। যার প্রতি বিন্দুতে প্রতি রেখায় আঁকায় অক্ষরে বাক্যে এক আল-াহর মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক এই মুহূর্তে এই আমার কামনা।

পরম শ্রদ্ধেয় কবি! যখন আপনার কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় সালাম দেয়ার পরে জিজ্ঞেস করেন, কে! আমি আমার নাম বলি, তখন আপনি আপনার প্রেমমাখা হাতখানা বাড়িয়ে দেন, আমি হাত রাখি সেই আপন করা হাতে, আপনার সুন্দর মুখের ওপর আমার দু'চোখ, আপনার মুখে ঠোঁট টেপা এক স্বর্গীয় মিষ্টি হাসি ভেসে ওঠে। এই স্মৃতি আমার হৃদয়েরপটে চির জাগরুক থাক এই দোয়া করবেন।

(শেখ আবুল কাসেম মিঠুন)
উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র

বাণী

আমি কবি আল মাহমুদের একজন দারুণ ভক্ত। তাঁর প্রত্যেকটি লেখা এখনো আমাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। তিনি শুধু এ দেশের কবি নন, তিনি সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীর– এমনকি সারা বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমীদের কবি। তাঁর সাহিত্য এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশী প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর *সোনালী কাবিন* ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ হওয়ার পর বিশ্ব-সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। তিনি আমার পূর্বসূরি জাসাসের সভাপতি ছিলেন। তাঁর কর্মোদ্দীপনা আমাকে উজ্জীবিত করে। বাংলাদেশের প্রধান এই কবির ৭৭তম জন্মদিনে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংসদের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(এম এ মালেক)
সভাপতি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি
জাতীয়তাবাদী সামাজিক সংস্থা (জাসাস)

www.pathagar.org

বাণী

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোরদের মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠের উদ্যোগে কবি আল মাহমুদের ৭৭তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা স্মারক প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। আমি এই সম্মানিত কবির দারুণ ভক্ত। তাঁর প্রত্যেকটি নতুন লেখার জন্য এখনো আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। যখনই তাঁর কোনো লেখা পাই, সাথে সাথে তা পড়ে শেষ না করা পর্যন্ত উঠতে পারি না। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ কবির অবদান অনেক। শুধুমাত্র আদর্শিক কারণে এই প্রধান কবিকে নিয়ে আজ বিভাজন সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। স্বাধীন দেশে জেলও খাটতে হয় এই মহান কবিকে। আল মাহমুদ শুধু বাংলাদেশের কবি নন, তিনি বাংলাভাষীদের প্রধান কবি। কলকাতায় এই কবির জনপ্রিয়তাও আজ অনেক উঁচুতে। অসুস্থতা কবিকে মাঝে মধ্যে লিখতে বাধাগ্রস্ত করছে। আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি, যাতে দেশ কবির কাছ থেকে আরো অসাধারণ কিছু সৃষ্টি পেতে পারে।

আমি কবি আল মাহমুদের ৭৭তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(চাষী নজরুল ইসলাম)
বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা

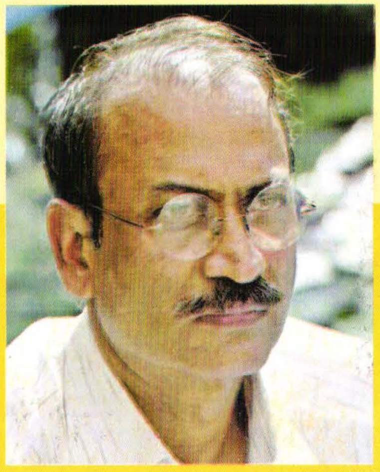

বাণী

কবি তোমার শৈশবের বন্ধু সঙ্গীত পরিচালক রাজা হোসেন খান। বেহালাবাদক অবিনাশের সুরে তন্ময় তুমি হয়ে যাও। ঝুঁকে পড় টেলিভিশনের পর্দায় শৈশবের সুহৃদকে দেখতে। আমরাও তোমার বন্ধু, তোমার কবিতার, তোমার প্রতি অফুরান ভালোবাসার, তোমার প্রতি অনেক প্রত্যাশার। তুমি রচনা করেছো কাব্য, গেঁথেছো গল্প, মর্ম স্পর্শ করে গেছো বাংলার জলভেজা কাদামাখা সাধারণ পাঠকের মন।

কথার কাঞ্চন নিংড়ানো জাদুকর, তুমি বল, মানুষ সব পারে না। তুমিও পারোনি বন্ধুদের মতো সঙ্গীতসাধক হতে। কিন্তু তুমি যা পেরেছো আমরা অনেকেই তা পারিনি। কখনোই তো পারবো না তোমার *সোনালী কাবিন*-এর খনি উদ্ধার করতে। তুমি কবিতা রসজ্ঞজনের একজন। তুমি কবি আল মাহমুদ।

তোমার শতায়ু আমাদের কামনা।

(মতিন রহমান)
বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা

www.pathagar.org

কবির অনুভূতি

নতুন কিশোরকণ্ঠ আমার ৭৭তম জন্মদিনকে নিয়ে শুভেচ্ছা স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমি বহুদিন ধরে কিশোরকণ্ঠের সাথে পরিচিত এবং তাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড, অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকি। আমার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাদের আগ্রহ দেখে আমি খুবই পুলকবোধ করছি। আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় কিছু লেখা বা বলার মতো অবস্থা নেই।
আমার পাঠক এবং অনুরাগীদের কাছে আমি দোয়া চাই। আল্লাহ যেন আমাকে ভালো রাখেন।

– আল মাহমুদ
৭.৭.২০১২

www.pathagar.org

আল মাহমুদ

আল মাহমুদ বাংলা ভাষার প্রধানতম আধুনিক কবিদের একজন। ১৯৩০-এর কবিদের হাতে বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতার উন্মেষ, তার সাফল্যের ঝাণ্ডা চিরসবুজের এই কবি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অদ্যাবধি তুলনারহিত কৃতিত্বের সঙ্গে বহন করে চলেছেন। নাগরিক চেতনায় আল মাহমুদ মাটির অনুভূতিতে গ্রামীণ শব্দপুঞ্জ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং চিত্রকল্প সংশ্লেষ করে আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত রেখাম্বিত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি কথাসাহিত্যে তাঁর মৌলিক শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর তিনি দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সরকারবিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আল মাহমুদ জন্মেছিলেন ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই এক বর্ষণমুখর রাতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামের মাতুলালয় মোল্লা বাড়িতে। আল মাহমুদের পূর্বপুরুষগণ ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে একটি ইসলাম প্রচারক দলের সাথে বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাইতলায় আসেন। ব্রিটিশ আমলে কাইতলার মীরবাড়ির মীর মুনশী নোয়াব আলী পরিবারের অসম্মতিতে পিতৃপুরুষের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ও খানকার বাইরে এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন এবং পড়াশোনা শেষ করে স্থানীয় আদালতে একটি চাকরি গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর তাঁর কর্মস্থল অর্থাৎ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন হওয়ায় মীর মুনশী নোয়াব আলী স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী মাক্কু মোল্লার এক কন্যাকে বিয়ে করেন। যদিও এই বিয়ে প্রাচীন পিতৃপরিবারের সাথে তাঁর বিচ্ছিন্নতাকে চিরস্থায়ী করে দেয়। মাত্র পঁচিশ তিরিশ মাইলের ব্যবধানে থেকেও তিনি কাইতলার মীর বাড়ির সাথে, তাঁর পিতৃপুরুষদের সাথে আর সম্পর্ক রাখতে পারেননি। মুনশী নোয়াব আলী তার পিতার মৃত্যুশয্যায় পিতাকে শেষবারের মত দেখতে কাইতলার মীরবাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। মীর আব্দুল গনি মৃত্যুবরণ করেন। মুনশী নোয়াব আলী

www.pathagar.org

আর কাইতলায় ফিরে যাননি। স্ত্রী, পুত্র নিয়ে শ্বশুর বাড়িতেই অবস্থান করেন। শ্বশুর নিজ কন্যা এবং জামাতাকে তাঁর অন্যান্য পুত্রদের সমান মর্যাদা এবং তাঁর বিপুল সম্পত্তির অংশ দিয়ে মোল্লাবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

আল মাহমুদের পিতা আব্দুর রব মীরের ছিল কাপড়ের ব্যবসা। পরবর্তীতে বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের অফিসার। মা রৌশন আরা বেগম ছিলেন গৃহিণী। একদিকে ধর্মীয় চেতনার কারণে ইংরেজি ভাষার প্রতি বিদ্বেষ অন্যদিকে পারিবারিক ঐতিহ্যের আলোকে কবিতার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ– এমনি এক দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে আল মাহমুদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

শিক্ষাজীবন

দাদী বেগম হাসিনা বানুর কাছে বর্ণ নিয়েই পাঠ শুরু হয়। মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। আল মাহমুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি তাঁর ছেলেবেলার গৃহশিক্ষক শফিউদ্দিন আহমদের হাতে। প্রকৃত অর্থে এই শফিউদ্দিন আহমদই তাঁকে নিয়ে যান পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনাস্বাদিত এক গ্রন্থভুবনে। সেই খুব ছোটবেলায় যখন তিনি স্কুলের চৌকাঠ মাড়াননি, এমনকি ঠিকমতো পড়তেও পারেন না, বানান করে করে সবেমাত্র পড়তে শিখছেন, তখনই শফিউদ্দিন আহমদ তাঁকে রাত জেগে জেগে পড়ে শোনাতেন ঠাকুরমার ঝুলি। আর আল মাহমুদ ছোটবেলাতেই আস্তে আস্তে উপলব্ধি করেন বাল্যশিক্ষার জঞ্জালের বাইরেও বইয়ের একটি বিশাল জগৎ রয়েছে। এই উপলব্ধিই পরবর্তীতে তাঁকে বানিয়েছে কবি, ভাবুক, পাখির মতো বন্য। ফলে প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগেই শিখে ফেলেছিলেন স্কুল পালানো। স্কুল পালিয়ে লোকনাথ পার্কের বিশাল কড়ইগাছের নিচে শুয়ে শুয়ে দেখতেন পাখিদের খুনসুটি, নীলিমার নীল, বৃষ্টির পতন। জর্জ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর অবশ্য তাঁর স্কুল পালিয়ে সময় কাটানোর জায়গা পরিবর্তন হয়ে যায়। একদিন তাঁর পাঠতৃষ্ণা তাঁকে পায়ে পায়ে নিয়ে যায় লালমোহন পাঠাগারে। এই পাঠাগারটি আল মাহমুদের জীবনের সত্যিকার শিক্ষা, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা স্বভাব এবং রুচি নির্মাণে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এখানেই আল মাহমুদ কিশোর বয়সেই পড়েন ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, ইতিহাসের ধারা বইগুলি।

কর্মজীবন

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলো আপামর বাংলা ভাষাভাষী বিশেষ করে বাংলার শিক্ষিত শ্রেণী। আন্দোলনের ঢেউ মফস্বল শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছড়ে পড়লে আল মাহমুদ এতে নিজেকে জড়িয়ে নেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও গঠিত হয়েছিলো ভাষা কমিটি এবং ভাষা কমিটির একটি লিফলেটে তাঁর চার লাইন কবিতা উদ্ধৃত করা হয়। আর সেই অপরাধে মীর আব্দুস শাকুর আল মাহমুদের ফেরার হয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় আগমন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি।

ঢাকায় এসে আল মাহমুদ তাঁর এক পূর্ব পরিচিত'র মাধ্যমে পরিচিত হন রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইয়ের সাথে। তারও পূর্বে ঢাকা এবং কলকাতার পত্রপত্রিকায় তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশ হলে তিনি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। ওই পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সাহিত্য', 'চতুষ্কোণ', 'চতুরঙ্গ', 'ময়ুখ' ও 'কৃত্তিবাস' প্রভৃতি। আল মাহমুদের যখন জীবিকার প্রয়োজনে একটি চাকরি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে দাদাভাই তখন আল মাহমুদকে ১৯৫৪ সালে দৈনিক মিল্লাতের প্রুফ সেকশনে প্রুফ রিডারের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের চেষ্টায় 'সাপ্তাহিক কাফেলা'য় সহসম্পাদক পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে মফস্বল বিভাগে বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর পর আসে ১৯৭১ সাল। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে, যে স্বল্পসংখ্যক কবি রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আল মাহমুদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ সালে তিনি শরণার্থী হয়ে কলকাতায় যান। সেখানেই তিনি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। তারপর একদিন এই কবি তাঁর চির পরিচিত সুহৃদ কলমকে ফেলে দিয়ে হাতে তুলে নেন রাইফেল। দেশে ফিরে তিনি মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার আশায় রণাঙ্গনের সশস্ত্রযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আসে স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন ঢাকায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' নামের একটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। '৭১-র পরবর্তী বাংলাদেশের অস্থির রাজনীতি, দুর্ভিক্ষ, সর্বহারা আন্দোলন ও রক্ষীবাহিনী ইত্যাকার পরিস্থিতিতে দেশ যখন বিপর্যস্ত তখন 'গণকণ্ঠ'-এর নিঃশঙ্ক সাংবাদিকতা এ দেশের পাঠক সমাজের কাছে ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। বিশেষ করে আল মাহমুদের সংবাদ প্রকাশের স্টাইল ও সাহসী সম্পাদকীয় দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করে। বিপরীত দিকে পত্রিকাটি পরিণত হয় শাসক গোষ্ঠীর চক্ষুশূলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ সালে তিনি কারাবরণ করেন। তাঁর আটকাবস্থায় সরকার দৈনিকটিও বন্ধ করে দেয়। ১৯৭৫ এ তিনি মুক্তি পান। তাঁর কবি খ্যাতি ততদিনে পৌঁছে গিয়েছিলো রাষ্ট্রপতির বাসভবন পর্যন্ত। কারামুক্তির পর তাঁকে শিল্পকলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে তিনি ওই বিভাগের পরিচালকরূপে অবসর নেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি আবার ফিরে যান সাংবাদিকতা পেশায়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক কর্ণফুলী'র সম্পাদক হিসেবে বেশ কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। বার্ধক্যে উপনীত কবি বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

লেখক জীবন

১৯৫৫ সালের কথা। কলকাতার 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। এই পত্রিকার জন্য আল মাহমুদ তিনটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে চৈত্র সংখ্যায় আল মাহমুদের তিনটি কবিতাই ছাপা হয়। একই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, ওমর আলী, শহীদ কাদরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পঞ্চাশের শক্তিমান কবিদের কবিতা। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি আল মাহমুদকে। বাংলা কবিতার ভাঁড়ারে আল মাহমুদ একের পর এক যুক্ত করে গেছেন, যাচ্ছেন অজস্র সোনালি শস্য, সাফল্যের পালক। আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি তিরিশ দশকীয় প্রবণতার মধ্যেই ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ দৃশ্যপট, নদীনির্ভর

www.pathagar.org

জনপদ, চরাঞ্চলের কর্মমুখর জীবন চাঞ্চল্য ও নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহের বিষয়কে অবলম্বন করেন। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের সুন্দর প্রয়োগে আল মাহমুদ কাব্যরসিকদের মধ্যে নতুন পুলক সৃষ্টি করেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' এবং ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্য 'কালের কলস'। এ দু'টি কাব্যের ভেতর দিয়ে আল মাহমুদ নিজেকে প্রকাশ করেন সম্পূর্ণ মৌলিক ও নিজস্ব ঘরানার কবি হিসেবে। তৃতীয় কাব্য 'সোনালী কাবিন' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। সমগ্র বাংলা কবিতার ইতিহাসে 'সোনালী কাবিন' একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এরপর আল মাহমুদের কবিতা একটি ভিন্ন বাঁক নেয় 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো'র ভেতর দিয়ে। মূলত আল মাহমুদের আদর্শগত চেতনারও পরিবর্তন হয় এসময়। 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো'তে তিনি মোহামেডানিজম বা ইসলামের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সেই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই কাব্যে। পরবর্তীতে 'প্রহরান্তের পাশ ফেরা', 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস', 'বখতিয়ারের ঘোড়া' প্রভৃতি কাব্যেও তিনি এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যে আল মাহমুদের আবির্ভাব এ দেশের গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য তাঁর সাহিত্য জীবন শুরুই হয়েছিলো গল্প দিয়ে। ১৯৫৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘদিন গল্প লেখায় বিরতি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে দৈনিক 'গণকণ্ঠ' সম্পাদনার সময় তিনি বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন। গল্পগুলো প্রকাশিত হলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিই নন, অন্যতম গল্পকারও। এ সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্পগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। আল মাহমুদ গল্প লিখেছেন ধীরে সুস্থে। খ্যাতি ও প্রশংসা গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে টলাতে পারেনি। তিনি এ পর্যন্ত যে কয়টি গল্প লিখেছেন সবই পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত। গল্প হিসেবে সার্থকও বটে। তিনি আমাদেরকে বেশ কিছু উপন্যাসও উপহার দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস 'কাবিলের বোন' ও 'উপমহাদেশ' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে শুধু ঋদ্ধই করেনি সংযোজনও করেছে ভিন্নমাত্রা।

পরিবার

১৯৫৫ সালে সৈয়দা নাদিরা বেগমের সাথে কবির বিয়ে হয়। ১৯৫৪ সালে যে যুবকটি রাবারের স্যান্ডেল পায়ে ঢাকায় পদার্পণ করেছিলেন কেবল কবিতাকে অবলম্বন করে, তিনি আজ বার্ধক্যে নুয়ে পড়া এক জ্ঞানবৃদ্ধ। জীবনের কত কিছুকে তিনি পেছনে ফেলে এসেছেন, কত কিছু তাঁকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু কবিতাকে তিনি যেমন ফেলে দেননি তেমনি কবিতাও তাঁকে ফেলে দেয়নি। আল মাহমুদ আর কবিতা একই সংসারে বাস করছেন আজ পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় ধরে। আর সেই সংসারে আরও আছেন কবির পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। কবির স্ত্রী ইতোমধ্যেই পরলোকগমন করেছেন।

ভ্রমণ

কবিতার ডালপালায় চড়ে বেড়াতে ভালোবাসেন আল মাহমুদ। কবিতার শব্দরাজি আহরণের জন্য তিনি ডুব সাঁতার দিয়েছেন বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোতে। শব্দের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন লোক থেকে লোকান্তরে। তেমনি অন্য ভাষার রূপ রস গন্ধ নিতে উড়োজাহাজের বিস্তৃত ডানায় ভর করে উড়ে বেড়িয়েছেন ফ্রান্সের ভার্সাই, প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, যুক্তরাজ্যের লন্ডন, ম্যানচেস্টার, গ্লাসগো, বেডফোর্ড, ওল্ডহাম, ইরানের তেহরান, ইস্পাহান, মাশহাদ, আরব আমিরাতের দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ, বনিয়াস, সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, ভারতসহ আরো নাম না জানা কত কত ক্ষুদ্র নগর জনপদ। এই ভ্রমণ, অর্জন, মনন, অভিজ্ঞতা– এইসবের সমন্বয়ে আল মাহমুদ বাংলা কবিতাকে পূর্ণ করে তুলেছেন কানায় কানায়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কবিতা : লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, প্রহরান্তরের পাশ ফেরা, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, মিথ্যেবাদী রাখাল, আমি দূরগামী, বখতিয়ারের ঘোড়া, দ্বিতীয় ভাঙন, নদীর ভেতরে নদী, উড়াল কাব্য, বিরামপুরের যাত্রী, না কোন শূন্যতা মানি না, প্রেম ও ভালোবাসার কবিতা, প্রেম প্রকৃতির দ্রোহ আর প্রার্থনা কবিতা, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, একচক্ষু হরিণ, দোয়েল ও দয়িতা, উড়ালকাব্য, বিরামপুরের যাত্রী, বারুদগন্ধী মানুষের দেশে, তুমি তৃষ্ণা তুমিই পিপাসার জল, তোমার জন্য দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, তোমার রক্তে তোমার গন্ধে, প্রেমের কবিতা সমগ্র প্রভৃতি।

ছোটগল্প : পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত, গন্ধবণিক, ময়ূরীর মুখ, নদীর সতীনসহ মোট দশটি।

উপন্যাস : কাবিলের বোন, উপমহাদেশ, পুরুষ সুন্দর, চেহারার চতুরঙ্গ, আগুনের মেয়ে, নিশিন্দা নারী, ডাহুকী, কবি ও কোলাহলসহ মোট বিশটি।

শিশুতোষ : পাখির কাছে ফুলের কাছে, একটি পাখি লেজ ঝোলা।

প্রবন্ধ : কবির আত্মবিশ্বাস, কবির সৃজন বেদন, আল মাহমুদের প্রবন্ধ সমগ্র।

ভ্রমণ : কবিতার জন্য বহুদূর, কবিতার জন্য সাত সমুদ্র প্রভৃতি।

আত্মজীবনী : বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ।

এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে আল মাহমুদ রচনাবলী।

পুরস্কার ও সম্মাননা

বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), জয়বাংলা পুরস্কার (১৯৭২), হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৪), জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৪), সুফী মোতাহের হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৭৬), ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০), কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার (২০০২), সমান্তরাল (ভারত) কর্তৃক ভানুসিংহ সম্মাননা পদক (২০০৪) প্রভৃতি।

www.pathagar.org

যেখানে তিনি অনন্য

কবি গোলাম মোহাম্মদ

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবিই শিশু-কিশোর কবিতা রচনা করেছেন আর আল মাহমুদ এ ক্ষেত্রে চমৎকার সফল।

আল মাহমুদের ছড়া বা শিশু-কিশোর কবিতায় চোখ দিলেই তা বোঝা যায়। আঠারো শতকের গোড়ার কবি হায়াত মামুদ (১৬৯৯-১৭৫৩) 'বিদ্যার মাহাত্ম্য' কবিতায় লিখেছেন, 'যার বিদ্যা নাই সে না জানে ভালো মন্দ/ শিরে দুই চক্ষু আছে তথাপি সে অন্ধ।' রামনিধি গুপ্ত 'স্বদেশী ভাষা' (১৭৪১-১৮৩৯) কবিতায় লিখেছেন, নানা দেশের নানা ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা/ পুরে কি আশা? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৪৯) 'মানুষ কে' কবিতায় লিখেছেন, 'কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার/ মানুষ তারেই বলে মানুষ কে আর?' অথবা 'বড় কে' কবিতায়, 'আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়/ লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।' কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৪-১৯০৭) কবিতায়, 'যে জন দিবসে মনের হরষে/ জ্বালায় মোমের বাতি'। 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় হেমচন্দ্র লিখেছেন, 'বলনা কাতর স্বরে/ বৃথা জন্ম এ সংসারে/ এ জীবন নিশার স্বপন।'

কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'পারিব না' কবিতায় বলেছেন, পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) 'আযান' কবিতায় 'কে ঐ শোনাল মোরে আজানের ধ্বনি'– এসব সুন্দর কবিতা লিখেছেন। এসব কবিতাতে এসে আবেগ উচ্ছ্বাসের মিশ্রণ দেখি। এর আগে বেশির ভাগ নীতিকথার ছন্দোবদ্ধ রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথে এসে জীবন প্রকৃতিসহ বহুমুখিতায় মুখর হয় শিশু-কিশোর কবিতা। তিনি

www.pathagar.org

'আমাদের ছোট নদী' কবিতায় বলেছেন, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে/ বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। এ রকম বিচিত্রধর্মী শিশু-কিশোর কবিতা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) থেকে সুকুমার রায়ে এসে শিশু-কিশোর কবিতা হাস্যরস ও উচ্ছলতায় ভরে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল', সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুরে' ও 'ষোলো আনাই মিছে' কবিতায় যেমন এসেছে শিশুমনস্কতা তেমনি এসেছে তির্যক কটাক্ষ, হাস্যকৌতুক ও এক ধরনের প্রতিবাদ। নজরুল ইসলামে (১৮৯৯-১৯৭৬) এসে তা ব্যাপক বৈচিত্র্যে ভরে ওঠে– খুকী ও কাঠবিড়ালী, খাঁদুদাদু, লিচুচোর, খোকার সাধ, প্রভাতী, সঙ্কল্প– বিচিত্র রসে ভরপুর। গোলাম মোস্তফাতে (১৮৯৭-১৯৬৪) শিশু-কিশোর কবিতার মনোহর ধ্বনিময়তা লক্ষ্য করা যায়। এরূপ জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) ও খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১) হৃদয় ভোলানো কবিতা লিখে মানুষের মন জয় করেছেন। বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৯), বুদ্ধদেব বসু, সুফিয়া কামাল, হোসনে আরার হাতেও উঠে এসেছে সুন্দর শিশু-কিশোর কবিতা।

চল্লিশের দশকের ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) ও আহসান হাবীবের (১৯১৭-১৯৮৫) হাতের চমৎকার কিশোর কবিতার সৌরভ পাঠকের মন দুলিয়ে দেয়। বৃষ্টি এলো কাশবনে/ জাগলো সাড়া ঘাস বনে/ বকের সারি কোথায় রে/ লুকিয়ে গেল বাঁশবনে। কল্পনা ও ছন্দের কারুকাজ আর হৃদয়স্পর্শী পরিবেশ রচনায় অসম্ভব পারঙ্গম ছিলেন ফররুখ। একই দশকের আহসান হাবীবের হাতেও উঠে এসেছে মননশীল কিশোর কবিতা। এরপর সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), প্রভাকর মাঝি (১৯২৪), সুকান্ত (১৯২৬-১৯৪৭), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭), শামসুর রাহমান (১৯২৯) এবং আল মাহমুদ (১৯৩৬)।

বাংলা শিশুতোষ কবিতা রচনার বিচিত্র বাঁক আমাদের চোখে পড়ে। সুকুমার রায়ের হাস্যরসের বাইরে রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিময়তা ও নজরুল ইসলামের কটাক্ষ, প্রতিবাদ ও বাণীভঙ্গি থেকে দূরে নিজস্ব ভঙ্গীমায় মুখর আল মাহমুদ। আল মাহমুদে এসে অবশ্যই বিস্মিত না হয়ে পারি না। আল মাহমুদের দেখা, চমৎকার প্রকাশ, বিষয় নির্বাচন, শব্দের ব্যবহার, উপমা নির্মাণ, প্রকরণ ও অলঙ্কারসিদ্ধতায় তিনি ব্যাপক সার্থক। অন্য কবিদের মতো আল মাহমুদের কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি আছে, মানুষ আছে, প্রেম আছে, ভালো লাগা ও বিক্ষোভ আছে, তবে তিনি ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন মাধুর্যে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। আল মাহমুদ যখন বলেন–

নারকেলের ঐ লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল
ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠাণ্ডা ও গোলগাল।
আবার, আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।

অথবা,

আম্মু বলেন, পড়রে সোনা
আব্বু বলেন, মন দে;
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠালচাঁপার গন্ধে।

এই ভাবে যখন আল মাহমুদের গায়কী শুরু হয়, তখন পাঠক বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। শব্দের সম্মোহন, উপমার উল্লাস ও বাণীভঙ্গির প্রবল স্রোতে ভেসে যান অনন্ত আনন্দলোকে।

মানুষের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ যেমন আল মাহমুদের কবিতায় এসেছে তেমনি এসেছে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বেদনা। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহও আল মাহমুদের কিশোর কবিতা থেকে বাদ পড়েনি।

ছড়া ও কিশোর কবিতার সংখ্যা খুব বেশি না হলেও বাংলা কবিতার একটি উঁচু অবস্থানে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। আল মাহমুদের প্রায় সব কাব্যগ্রন্থের সাথেই রয়েছে দু'চারটি শিশু-কিশোর কবিতা। এটা তাঁর একটা টেকনিক। এ ছাড়াও 'পাখির কাছে, ফুলের কাছে', 'একটি পাখি লেজঝোলা' আল মাহমুদের অনবদ্য ছড়াগ্রন্থ– যা পাঠকদের বিমোহিত করেছে।

আল মাহমুদের কিশোর কবিতায় পাঠক উচ্ছ্বসিত হয় কল্পনার রঙধুন চোখের সামনে তুলে ধরে ক্লান্তিহীন এক চমৎকার বাংলাদেশ। উল্লাসের সরস ধারায় লাফিয়ে ওঠে মন এবং সরবে চিৎকার করে বলে বাহ! চমৎকার।

লিয়ানা গো লিয়ানা
সোনার মেয়ে তুই,
কোন পাহাড়ে তুলতে গেলি–
জুঁই।

অথবা,

ঝালের পিঠা, ঝালের পিঠা
কে রেঁধেছে কে?
এক কামড়ে একটুখানি
আমায় এনে দে।

শব্দের সুরে অন্য অর্থ, বক্তব্যের আড়ালে অন্য মাধুর্য, রূপকল্প, বর্ণনার সৌকার্য, পরিশীলিত প্রকাশের চমৎকারিত্ব আল মাহমুদের কিশোর কবিতাকে করে তুলেছে অনন্য।

আব্বা হলেন কাকতাড়ুয়া আম্মা হলেন পাখি
বুবুরা সব ভুঁইকুমড়ো পাতায় ঢেকে রাখি।

কিংবা,

একবার পাখিদের ভাষাটা যদি
শেখাতেন সোলেমান পয়গম্বর।

এভাবে আমরা তার বিস্ময়ভরা কবিতার অঞ্চলে প্রবেশ করি এবং প্রাচুর্যে প্রস্বর প্রান্তর ঘুরে আসি। আমাদের অন্তর আলোকিত, চিত্ত দোলায়িত ও বিমুগ্ধ হয়। উত্তীর্ণ কবিতা চিরকাল তাই করেছে।

www.pathagar.org

আল মাহমুদ কতটুকু জানি?

জুবাইদা গুলশান আরা

কবি আল মাহমুদ আমাদের দেশের এমন একটি নাম যা সর্বস্তরের পাঠকের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় মিশে আছে। বাংলা সাহিত্যে পূর্ব এবং পশ্চিম এ শব্দ দু'টির তাৎপর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশৈশব দুই বাংলার আলো বাতাস, মাটি মানুষ, সমাজ মানুষের মধ্যে যারা বেড়ে উঠেছিলেন, তাদের মধ্যেই এক সময় গড়ে ওঠে এক নতুন অনুভব, তা হল পূর্ব বাংলার নিজস্বতা। কবি জসীমউদ্‌দীন, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, বন্দে আলী মিয়া, মীর মশাররফ হোসেন, এস ওয়াজেদ আলী প্রমুখ সাহিত্যিকদের গড়া ভিত্তি ভূমিতে, নজরুলে বিশাল বিশ্বজনীন চিন্তায় যে পরিবর্তন গড়ে উঠেছিলো তার পরবর্তী সাহিত্য চর্চায় চলে আসে মানুষ প্রভৃতি ধর্মাধর্ম, প্রকৃতি এবং জীবনের সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ত এক সৃজনশীল নতুন গঠন প্রক্রিয়া এবং স্বাধীন চিত্তের হয়ে ওঠার যাত্রা। সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব, জীবনানন্দ দাশ এবং পরবর্তী কবিদের হাতে গড়া পাদপীঠে গড়ে ওঠে নতুন অনুভবের পলিমাটি।

আমাদের এই দেশে যে বাংলা ভাষার আন্দোলন, তারপর ঊনসত্তরের গণ জাগরণ, সেই পথ ধরে স্বাধীনতার বিশাল অভ্যুদয় ঘটে, সেই ধূ ধূ বালিয়াড়ির বুকে জেগে ওঠে নতুন চেতনার অঙ্কুর। বিষয়টি তলিয়ে দেখলে এক ধরনের সুখানুভূতি হয়। সাতচল্লিশের দেশ ভাগ হওয়া ও পরবর্তী বছরগুলি ছিলো একটা আত্মপরীক্ষার সময়। পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা, জীবন যুদ্ধ বোধ, এবং সংগ্রামের ধরন যেন বদলে যায় আমাদের সাহিত্য চর্চার জগতে এসে। গীতময় ছন্দময় জীবনচর্যার আঙিনা থেকে আমাদের সাহিত্য এসে দাঁড়ায় বৃহত্তর বাস্তবতা, নির্মমতা এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে। পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন অটুট থাকলেও ভেতরে ভেতরে কবি লেখকদের মধ্যে তাগিদ দেখা দেয় নিজেদের মতো করে জীবন ও পরিপার্শ্বকে আবিষ্কার করার। নদী ভাঙনে নতুন চর জেগে উঠলে কৃষক যে বীজ বোনে, ঠিক একই শ্রমে ঘামে এদেশের কবি সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে গড়ে তুলতে থাকেন। সেই গড়ে তোলা যেন একজন শ্রমিকের শ্রমের আনন্দ নেহাইয়ে তপ্ত লোহাকে কৃষকের লাঙল করে সৃষ্টি করার আনন্দ। আজ নবজাগৃতির আনন্দে, গর্বিত ঐতিহ্যের দাবি নিয়ে আমি কবি, সাহিত্যিক আল মাহমুদকে দেখতে পাই, বুঝতে পারি। আল মাহমুদের সাহিত্য সৃষ্টিকে দেখতে চেষ্টা করি একজন সচেতন পাঠকের চোখ দিয়ে। তার সৃষ্টিকে সমালোচনা বা আলোচনা করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমার এ লেখায় তাঁকে দেখার চেষ্টাই রয়েছে প্রধানত। কারণ আমি তাঁকে আবিষ্কার করি মূলত কবি হিসেবে। চমকে উঠি তাঁর কাব্যের পরতে পরতে বিচিত্র শব্দ বিন্যাস দেখে। 'সোনালী কাবিন' কবিতায় এই দেশ, মাটি, ইতিহাস, শস্যদানা, কামনা বাসনা, পলে পলে বদলে যাওয়া স্রোতস্বিনী, সবাই যেন কবির কাছে ধরা দিয়েছে, বন্ধুর মতো। ক্রীড়া উচ্ছ্বল কবি তাই পাঠককে জানাচ্ছেন–

লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোনো কবি করে না কসুর

আধুনিক বিশ্ব যেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে বিভ্রান্ত করে রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত সেই মানব জীবনকে আল মাহমুদ গ্রহণ করেছেন শ্যামলিয়া মাড়িয়ে, জীবন পান করে। যেন লোক লোকান্তর অতিক্রম করে তিনি এনে দিলেন একালের কলস, সোনালী কাবিন। আমাদের এ কবির সঙ্গে গভীর সংযোগ সেই জন্যই মাইকেল মধুসূদনের কবিসত্তা। কবিতার জগতে আমি তাকে দেখি এক দক্ষ সাতারুর মতো ডুব দিয়েছেন মননের গভীরে। দহন করছেন নিজেকে। খাঁটি হয়ে ওঠার জন্যই বুঝি তার এ আয়োজন। জীবন সমুদ্রে তার এ অবগাহনে উঠে আসছে বিস্ময় বিহ্বলতা, দর্শন তত্ত্ব, ইতিহাস ও অলৌকিক আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

মাঝে মাঝে কবির কবিতা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে জ্যোৎস্নায় ভেজা চন্দ্রালোকিত রাত্রি নীল আকাশে ভেসে যাচ্ছে বালিহাঁসের দল। কবির গভীর আলো আঁধারির চেতনা তাকে ভাসিয়ে নিচ্ছে এসব সিসেমের দরজায় যার আড়ালে জীবন তাকে দেখাচ্ছে হাজার আলোর মিলিঝিলি যা কেবল তারই মুখে ফেলছে ভালোবাসার আলো। তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্য বিন্যাসের মাঝখানে, মাতামাতির মাঝখানে, সজাগ এক পথ নির্দেশক যে পাহারা দিচ্ছে, নিজেকেই। সতর্ক করছে এইতো ছতর ঢাকার সময়। কোথায় হারিয়ে এসেছো তোমার বুকের সেফটি পিন?

আজ ইবলিশকে তোমার ইজ্জত বাঁচাতে দিওনা।
(বখতিয়ারের ঘোড়া)

আল মাহমুদের কাব্য দর্শন, আত্মার পর্যবেক্ষণ নিয়ে সকল সুদক্ষ আলোচক বহু লেখা লিখেছেন। তার লেখায় রাজনৈতিক নৈতিক ও পরস্পর বিরোধিতার কথা এসেছে। বহু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে বাংলার মানুষের হাত ধরে এক পর্যটকের মতো তিনি বিশ্বকে দেখে বলেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন– আমার শুভানুধ্যায়ীরা বলেন,

www.pathagar.org

তোমার সব ঠিক আছে। এমনকি কবিতাও।

কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে তোমার পথ নিয়ে।

(পথের কথা ঃ নদীর ভিতরে নদী)

অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনে আসবেই। কবিও তাই নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন। এই খোঁজার ব্যাপকতাই গড়ে দেয় কবির বিশ্বকে। কবি গভীর বেদনায় মানুষের আত্মার সংগ্রামকে লক্ষ্য করেন, কৌটিল্যের চতুর আগ্রাসনকে মানুষের মধ্যে দেখে ব্যথিত হন। মাঝে মাঝে তার হৃদয়ের বিদ্রোহ দেশ মাতৃকাকেও মনে করিয়ে দেয়–

ছেড়ে দাও আমার হাত,
আমি দেশহীন।
শেষ দশার কবির মতো
আকাশের দিকে আজান হেঁকে
বাতাসে বিলিন হয়ে যাই।
যাবোনা তোমার সাথে, হে দেশ জননী।

(দ্বিতীয় ভাঙন)

জীবন পিপাসার প্রবাহ আমাকে নিয়ে গেছে 'পরাণের গহীন ভিতরে' যেখানে গ্রামীণ বাতাস জীবনের কথা বলে, গান গায়, দেশের জন্য কাঁদে। দেশ মাটি এবং মানুষ কত গভীরভাবে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে আছে তা দেখতে পাই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের লেখাগুলির মধ্যে। 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবির মন নানা ছবি তৈরি করে। রঙ তুলিতে ফোটে আনমনা এক কিশোর মনের দুঃখ–

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতেরই রক্ত।

কবি হিসেবে আল মাহমুদ কোনো আড়াল খোঁজেননি। উপমা উৎপ্রেক্ষা বা পোয়েটিক জাস্টিস তার কবিতার কোথাও ছন্দপতন ঘটায়নি। কঠিন নির্মম বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার গম্ভীর কুশলী ভাবনা তাকে অদৃশ্য এক সোনার কাঠি ছুঁইয়ে নিয়ে গেছে নৃত্যপর শিশুর জগতে। সেখানেও পরাবাস্তবতার গূঢ় রহস্য নয়, কৈশোরের মেঘরোদ্দুরের ঝিলিমিলি শব্দের নূপুরে, ছড়ার ছন্দে ছুঁয়ে যায় আমাদের। উনসত্তরের গণজাগরণের দ্রোহ, নিষ্ঠুর প্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে মোকাবেলা করার সাহস তিনি তৈরি করেছেন ছড়ার মধ্যে–

ট্রাক, ট্রাক, ট্রাক
শুয়োর মুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ
পতারাই তবে সোনামনিকে
আগুন ডেবলে দে।

(উনসত্তরের ছড়া-১)

অথবা

তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য
আমি না হয় পাখিই হবো
পাখির মতো বন্য।

(পাখির মতো: পাখির কাছে ফুলের কাছে)

এসব ছড়া বা কবিতাগুচ্ছ তৈরি করে এক মনোরম স্নিগ্ধতা। যেখানে এক ভিন্ন চিন্তার বালক তার মায়ের হারিয়ে যাওয়া নোলক খুঁজে বেড়ায় সারা দেশে, অথবা–

গাঁয়ের দিকে উড়াল মারো
শব্দ চুরির ইচ্ছায়
অথবা *কান্না থেকে কাব্য লেখার*
জন্য দুঃখী লোকের চরের কাছে
ভিড়াও তবে নৌকা

(মন পবনের নাও)

এসব কবিতা ছড়িয়ে দেয়া শস্য বীজের মতো, কবির স্বপ্নকে ধারণ করে তৈরি করেছে এক আশ্চর্য পৃথিবী। এই কবি আদিম গুহব মানবীর কাছে জীবনের রহস্যের পাঠ নিয়েছেন। তাই জীবনের সঙ্কীর্ণ শিক্ষা নয় একেবারে প্রকৃতির অন্তর্গত যা কিছু মৌলিক, তাই ধরা দিয়েছে তার কাছে। শুদ্ধতম কবি, অলৌকিক যাত্রী এ ধরনের গতানুগতিক বাক্য আমি তাঁর প্রতি ভক্তিবশত বলতে ইচ্ছুক নই। তিনি আলো আঁধারির মধ্যেও আলো খুঁজে পান, এটি একটি স্বীকৃত সত্য। তিনি সজাগ কবি, তাই অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেন না কৃত্রিম সাজসজ্জায়। তার সমগ্র কমিটমেন্ট জীবনের কাছে। একাডেমকি ফ্রেমে তিনি জীবনকে আড়ষ্ট করেননি। কবিতা, বলা যায় আপনা থেকেই তার কাছে আসে। কারণ তার ভালোবাসাটা খাঁটি।

মাত্র বত্রিশবছর বয়সে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান তিনি। পৃথিবীর নানা ভাষায় তার কাব্য অনুবাদ জনপ্রিয়তা ও সম্মান লাভ করেছে। জীবনের নিষ্ঠুরতা, মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ততার ফলশ্রুতিতে তার লেখা উপন্যাস 'উপমহাদেশ' একটি নির্মম যুদ্ধকালীন দলিল। নিশিন্দা নারী, কাবিলের বোন, ডাহুকী, আগুনের মেয়ে, এসব উপন্যাস সম্বন্ধে যখন লিখতে চাই তার জন্য প্রচুর সময় প্রয়োজন।

এই কবি রাজনৈতিক চেতনার নানা রূপকে উল্টে পাল্টে বুঝতে চেষ্টা করেছেন এসব উপন্যাসে। ধর্মীয় চিন্তা, আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ সবই এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। কোনো কোনো উপন্যাস তিনি যেন নিজেই আবিষ্কার করেছেন জীবনের নানারূপ। সত্যেমিথ্যায় মেশা সে জীবনকে বোঝবার কাতরতা তার উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য। তার বিশ্লেষণ ভিন্ন সময়ে করা যাবে। একজন মানুষ যখন কলম ধরে তখন তার অনেক পরিচয় গড়ে ওঠে। সে আর তখন একজন মানুষ মাত্র নয়। সে তখন প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত একটি শক্তির আধার।

'সৌরভের কাছে পরাজিত' গল্পটির মধ্যে এক অসাধারণ সরলতার বিদ্যুৎ যা তারুণ্যের মধ্যে সহসাই চোখে পড়ে। 'আমরা ডাকাত নই, আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ আছে' এই যুবক এমন এক সজ্জিত তারুণ্য যে চারদিকের মধ্যে নিজেকে প্রমাণ করতে করতে হয়তো বা হারিয়ে ফেলেছে তার সত্তাকেই। শুধু এক পলকের সৌগন্ধ প্রিয়তা তাকে জীবনের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে বোধহীন নিষ্ঠুরতা থেকে।

কেউ নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়, কেউ তাকে সঙ্গী করে চলে। মানব সমাজের মধ্যে সে একলা এক বিবাগী বাউল অথচ ভালোবাসার রসে মনটি তার পরিপূর্ণ। স্থিতি এবং গতির সেই মানুষটিকেই বোঝার এই সামান্য চেষ্টা আমার। কবির নিজের ভাষায় বলি– "পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা" সে আকাঙ্ক্ষা চিরঞ্জীব থাকুক এই কামনায়।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ

www.pathagar.org

আল মাহমুদ

আমাদের সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে

আবদুল হাই শিকদার

এখন থেকে এক শ' বছর পরে অথবা এক হাজার বছর পরে, কিংবা আরও পরে, যদি তখনও মানুষ থাকে পৃথিবীতে, কেউ না কেউ প্রশ্ন করবে আমাদের সময় ও জীবন নিয়ে– ন্যায়, নীতি, সততা, দেশপ্রেম, মনুষ্যত্ব, বিচার ও প্রেমহীন একটি সময়ে ওই লোকগুলো বেঁচে ছিল কিভাবে? তাদের উদ্দেশে এই হানাহানি, বিভেদ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অসম্প্রীতি ও অবিবেচনায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া সময়ের পত্রহীন, পুষ্পহীন, বাষ্পহীন, অনুতাপহীন প্রান্তর থেকে বলে রাখছি (যদি এই লেখা তাদের কাছে পৌঁছে)– আমাদের অনেক কিছু ছিল না, এ কথা সত্য। বন্য শুয়োরের কাদা ঘাঁটার মতো সীমিত, সঙ্কীর্ণ ও নোংরা হয়ে পড়েছিল আমাদের জীবন। তারপরও আমরা বেঁচেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম, আনন্দ ও বেদনার নুন-পানিতে ভেসেছিলাম শুধু একটি কারণে– আমাদের মধ্যে আল মাহমুদ ছিলেন। কবি আল মাহমুদ ছিলেন। মাত্র একজন কবি ছিলেন বলেই আমাদের প্রতিদিনের রুমালগুলো সূচিকর্মহীন ছিল না।

আজকের এই দিনে, এখনও যাদের মানুষ হিসেবে ধরে নেয়া যায়, এখনও যারা সাদা আর কালোর পার্থক্য কিছুটা হলেও ধরতে পারেন, তাদের বলি, আল মাহমুদ আমাদের মধ্যে আছেন বলেই আমরা আছি। যে কয়টি সংবাদ আমাদের প্রতিটি সূর্যোদয়কে সম্ভাবনাময় করে তোলে তার অন্যতম আল মাহমুদের বিচরণশীলতা। তাঁর সচলতা ও সক্ষমতা। তাঁর বহমান সৃষ্টিশীলতা। তিনি আছেন বলেই আমাদের দিনগুলো কোলাহলের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতেও হারিয়ে যায় না। ডুবতে ডুবতেও ডুবে যায় না, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শিশুর গালে চুমু খায়। আর রাতগুলো কালো হতে হতেও পুরো কালো হয় না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস তার নীরবতাকে চুরমার করলেও সে কিছুটা উদ্বেগহীনতার মধ্যে আরাম খোঁজে।

www.pathagar.org

তারপর স্বপ্ন দেখে ডাবের মতো চাঁদ, ঠাণ্ডা ও গোলগাল।

দুই.

বাংলা সাহিত্যে মীরদের প্রথম আবির্ভাব ১৮৪৭ সালে মীর মশাররফ হোসেনের মধ্য দিয়ে। প্রথম এবং অসাধারণ ছিলেন সেই মীর। ১৮৮৫-তে যদি তাঁর বহু বিখ্যাত 'বিষাদ সিন্ধু' নাও প্রকাশিত হতো তাহলেও তাঁকে নিয়ে আজ আমরা যা বলছি, তার ব্যত্যয় ঘটত না। যে কোনো বিচারেই তিনি আমাদের নবজাগরণের অগ্রদূত। এই মীরের জন্মের ৮৯ বছর পর ১৯৩৬ সালে দেশের আরেক প্রান্তে দ্বিতীয় মীরের জন্ম। এই মীর আল মাহমুদ। কবি আল মাহমুদ।

প্রথম মীরের সঙ্গে দ্বিতীয় মীরের মিল ও অমিল অনেক। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'সোনালী কাবিন' কাব্যের পর আর যদি কিছু নাও লিখতেন, তাহলেও আল মাহমুদ আল মাহমুদই থাকতেন।

দুই মীরের বাড়ি দুই নদীর তীরে। একজন গড়াই কূলের। অন্যজন তিতাস তীরের। একজনের বিষাদ সিন্ধু এবং অন্যের সোনালী কাবিন– সমান মাত্রা ও শব্দবন্ধের। 'স' ও 'ব' তাদের মধ্যে সাধারণ। তবে অমিলটা হলো একজন মীর লিখতেন নামের আগে, অন্যজন মীর উপাধি কখনোই ব্যবহার করেননি।

কাজী আবদুল ওদুদ অবশ্য এই দুই মীরকে নিয়ে তার বিখ্যাত 'মীর পরিবার' গল্পগ্রন্থ লেখেননি। তবুও আহমদ মীর, মোস্তফা মীর, আশরাফ মীর এঁরা 'মীর' নিয়েই বেড়ে উঠেছেন।

তিন.

আসলেই 'মীর' বর্জনকারী আল মাহমুদ আমাদের জসীমউদ্‌দীন। আমাদের নকশিকাঁথার মাঠ। আমাদের সোজন বাদিয়ার ঘাট। আমাদের বালুচর।

তিনি আমাদের জীবনানন্দ। আমাদের মহা পৃথিবী। আমাদের সাতটি তারার তিমির।

তিনি নজরুলের সকালবেলার পাখি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাত সঙ্গীত।

তিনি আছেন আমাদের জাগরণে। আমাদের স্বপ্নে। আমাদের মনে। আমাদের দেহে। আমাদের তিনশত চল্লিশ নদীর বাঁকে বাঁকে। তিনি আছেন আমাদের পানিউড়ি পাখির ছতরে। তিনি আছেন ওপাড়ার সুন্দরী রোজেনার সর্ব অঙ্গের ঢেউয়ে। মক্তবের মেয়ে আয়শা আখতারের খোলা চুলে। তিনি আছেন আমাদের ইসবগুলের দানার মতো জলভরা চোখে। আছেন শুকিয়ে যাওয়া নদীর তলদেশের চিকচিকে বালুতে।

আল মাহমুদ আছেন আমাদের সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে। পাহাড়পুরে। তিতাসে। ড্রেজার বালেশ্বরে। আছেন মুক্তিযুদ্ধে। আছেন বিরামপুরে। আছেন আমাদের খড়ের গম্বুজে। আমাদের প্রত্যাবর্তনের লজ্জায়। স্বপ্নের সানু দেশে। আল মাহমুদ আছেন আমাদের ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে। তিনি আছেন নিম ডালে বসে থাকা হলুদ পাখিটিতে। তিনি আছেন 'ফাবি আইয়ি আলা ই-রাব্বিকুমা তুকাজ্বিবান'-এ। আছেন আমাদের চিন্তায়। চেতনায়। আমাদের সৃষ্টিশীলতায়।

চার.

আল মাহমুদ আছেন বলেই এখনও স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ। আল মাহমুদ আছেন বলেই আমরা এখনও হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি। আল মাহমুদ আছেন বলেই ড. ইউনূস বিশ্বসভায় বাংলাদেশের মৌলিক মৃত্তিকা হয়ে ওঠেন। উঁচুতে তুলে ধরেন দেশের সম্মান ও মর্যাদা। আল মাহমুদ আছেন বলেই মুসা ইব্রাহীম, এম এ মুহিত, নিশাত আর ওয়াসফিয়া এভারেস্টের ওপর পা রাখেন। আর সাকিব আল হাসান হয়ে ওঠেন বিশ্বসেরা অল রাউন্ডার।

নোংরা, সঙ্কীর্ণ, মূর্খ ও স্বার্থপর কিছু প্রাণীকে এখনও যে এদেশের মানুষ কবি বলে সম্মান করে, সে তো শুধু এই কারণে যে আল মাহমুদ এখনও বেঁচে আছেন।

পাঁচ.

কবি আল মাহমুদকে নিয়ে যে কথাগুলো লিখলাম তা পড়ে অনেকের গা জ্বলে যাবে। শরীর চুলকাবে। আমাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মতো যারা একটু বেশি শয়তান, তারা বলবে আবেগের দোকানদারি করা হচ্ছে। অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে।

তাদের জন্য আমাদের সহানুভূতি থাকবে। আমরা তাদের ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দেবো। তারপর বলব, তোমাদের জীবন হলো নর্দমার ধারে। হাজারীবাগের ট্যানারির পচা পানিতে হয় তোমাদের অবগাহন। তোমাদের জীবন দুর্নীতি নিয়ে। তোমাদের সকাল হয় দুর্নীতির মাধ্যমে। দিন কাটে দুর্নীতি করে করে। রাতে ঘুমাও দুর্নীতির বিছানায়। স্বপ্নও দেখো দুর্নীতি নিয়ে। সাহিত্য তোমাদের মতো 'হারামখোর'দের বিষয় নয়। আর কবিতা, সে তোমাদের সইবে না। 'সুসংবদ্ধ কথামালা' নিয়ে স্বপ্নের সওদাগরি যারা করে, তাদের ভাষা বোঝার জন্য নতুন চরের মতো হৃৎপিণ্ড চাই।

স্বপ্নের কথা বলতে বলতেই আমার চোখের চারদিকে তৈরি হচ্ছে ঘোর। এক ধরনের মায়াবী পর্দা উঠছে দুলে। কাজলের ছোঁয়ায় জেগে উঠছে প্রাণ। ভোরের মোরগের ডাক কানে আসছে। মোহনা কাছাকাছি বলেই বোধ করি শুনছি নোনা দরিয়ার ডাক। আল মাহমুদ কখনও খ্যাতির জন্য লেখেননি। লিখেছেন মনের তাগিদ থেকেই। তাইতো সমালোচকদের তিনি থোরাই কেয়ার করেন। যদিও তিনি কখনো নোবেল পুরস্কার পান এবং সমালোচকরা তাঁর দিকে ঢিল ছুড়ে দেয় তখন কী করবেন তিনি? কবি আল মাহমুদ থাকবেন নির্বিকার। কণ্ঠে হয়তো বড় জোর বাজতে পারে নিজেরই কয়েকটি চরণ–

'বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে আইল বাঁধা জমিনের ছক
বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য জাদুমন্ত্রবলে
অকস্মাৎ পাল্টে গেল। ত্রিকোণ আকারে যেন
ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃণ্ময়ী।
আর সে জ্যামিতি থেকে
ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
আমার চেতনাজুড়ে খুঁটে খায় পরস্পরবিরোধী আহার?

www.pathagar.org

চার দশকের চেনা

মোশাররফ হোসেন খান

পঞ্চাশের কবি আল মাহমুদ। আমার প্রিয় মাহমুদ ভাই। তাঁর সাথে চেনা-জানা আমার চার দশকের। অর্থাৎ চলি-শ বছর। সময়ের হিসাবে কম সময় নয়। বলা যায় দীর্ঘকাল।

প্রথম দশক তাঁর সাথে পরিচয় ছিলো আমার কেবল লেখা-জোখার মাধ্যমে। কারণ আমি তখন থাকতাম যশোরে। ঢাকায় প্রায় আসাই হতো না। ফলে দেখা-সাক্ষাতের কোনো সুযোগই ছিলো না। তবে চেনা-জানা ও পরিচয়ের বড় মাধ্যম ছিলো তাঁর প্রকাশিত বইপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো।

মাহমুদ ভাইকে প্রথম দেখেছিলাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রে। ২২ তোপখানা রোড, পুরানা পল্টন অফিসে। সেই প্রথম আমার ঢাকায় আসা। ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে সবেমাত্র প্রকাশ পেয়েছে– "আফগানিস্তান : আমার ভালোবাসা"। সম্পাদনা করেছেন কবি আল মাহমুদ ও কবি আফজাল চৌধুরী। কবি আফজাল চৌধুরী তখন সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালক। কবি-বন্ধু মুকুল চৌধুরী এক পত্রে আমাকে ঐ বৃহৎ সঙ্কলনে একটি কবিতা লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। লিখেছিলাম। ছাপাও হয়েছিল। সংস্কৃতি কেন্দ্রে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো ঐ সঙ্কলনটি সংগ্রহ করা। সেখানে গিয়ে মুকুল ভাইয়ের সাথে দেখাতো হলোই, বাড়তি যেটা পেলাম সেটা হলো– কবি আফজাল চৌধুরী ও কবি আল মাহমুদের সাথে সাক্ষাৎ। দুই কবি বসে গল্প করছিলেন। হঠাৎ আমার উপস্থিতিতে এবং পরিচয়ে দু'জনই সমান খুশি হলেন। আর আমার প্রিয় দুই কবিকে একত্রে পেয়ে খুশিতে উদ্বেলিত হলাম আমি। অনেকটা ভাষা হারার মতো। মাহমুদ ভাইয়ের পরনে সেদিন স্যুটকোট ছিলো। চেহারাটা ছিলো উজ্জ্বল। দেখার মতো এক সুপুরুষ। আমি মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তাঁরা দু'জনই আমার প্রকাশিত কবিতাটির প্রশংসা করেছিলেন। সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারি না। সেইতো প্রথম দেখা!–

আশির দশকে আমি যশোরের সকল পাট গুটিয়ে ঢাকায় উপস্থিত হলাম। অনেকটা আকস্মিকভাবে। উদ্দেশ্য– একমাত্র সাহিত্যেই নিবেদিত হওয়া। কাজটা যে আদৌ সহজ সাধ্য নয়– সেটাতো আমার জানা-বোঝা হয়ে গেছে আকৈশোর। তারপরও সাহস ও স্বপ্নে বুক বেঁধে পদ্মা পাড়ি দিলাম।

ঢাকায় আসার পর প্রথম যাঁদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করলাম তাঁরা হলেন আমার পূর্ব পরিচিত এবং গুণমুগ্ধ কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কবি মতিউর রহমান মলি-ক, কবি মুকুল চৌধুরী, কবি সোলায়মান আহসান, কবি হাসান আলীম প্রমুখের সাথে। অগ্রজদের মধ্যে ছিলেন কবি আল মাহমুদ, কবি আবদুস সাত্তার, আবদুল মান্নান তালিব প্রমুখ। পরে অবশ্য এই তালিকা দীর্ঘ থেকে সুদীর্ঘ হয়েছে। এখনও হচ্ছে।

মাহমুদ ভাইয়ের সাথে একেবারে কাছ থেকে দেখা এবং জানা তিন দশকের একটু বেশি সময় ধরে। আমার সৌভাগ্য যে অনুজ কবি হিসেবে তিনি আমাকে অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়েছেন। আমার যখনই কোনো নতুন বই প্রকাশ পেয়েছে, সাথে সাথে মাহমুদ ভাইয়ের হাতে তার একটি কপি পৌঁছে গেছে। তিনি কাল মাত্র দেরি না করে সেই বইয়ের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। আমিও তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস', 'প্রহরান্তের পাশ ফেরা', 'এক চক্ষু হরিণ', 'দোয়েল ও দয়িতা', উপন্যাস– 'কাবিলের বোন' প্রভৃতি গ্রন্থের সুদীর্ঘ আলোচনা-প্রবন্ধ লিখেছি।

www.pathagar.org

মনে পড়ছে, মাহমুদ ভাইয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রাম সাহিত্যে একটি বিশেষ সংখ্যা সাজজাদ ভাইকে বলে প্রকাশ করেছিলাম। সেখানে আমারও একটি প্রবন্ধ ছিলো–'কবি আল মাহমুদ : উজ্জ্বল উত্তরাধিকার'। অবশ্য কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের ৫০ বছর পূর্তিতেও সংগ্রাম সাহিত্যে বিশেষ পাতা প্রকাশিত হয়েছিলো আমার প্রণোদনায়। আজ ভাবতে ভালো লাগছে বৈকি!

মাহমুদ ভাইয়ের সাথে একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হতো মূলত বিভিন্ন সাহিত্য সভা ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এক সময় বিপরীত উচ্চারণ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, মাসিক নতুন কলম, মাসিক ফুলকুঁড়ি, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ প্রতি মাসে সাহিত্য সভা, স্মরণ সভা ও বিশেষ সাহিত্য সভার আয়োজন করতো। অগ্রজদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কথাশিল্পী শাহেদ আলী, কবি আল মাহমুদ, কবি আবদুস সাত্তার, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, কবি আফজাল চৌধুরী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সানাউল-হ নূরী, নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। তাঁরা থাকতেন সভাপতি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে। আর আলোচক হিসেবে থাকতাম আমি, কবি মতিউর রহমান মলি-ক, কবি সোলায়মান আহসান, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, কবি বুলবুল সরওয়ার প্রমুখ। সাহিত্য সভা ছাড়াও চলতো আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে সাহিত্য আড্ডা।

এ ছাড়াও মাহমুদ ভাইয়ের সাথে শিল্পকলা একাডেমী ও দৈনিক সংগ্রামে চলতো বিস্তর আড্ডা। এই দুটো প্রতিষ্ঠানে তখন তিনি চাকরি করতেন। শিল্পকলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন এবং দৈনিক সংগ্রামে বখতিয়ার ছদ্ম নামে লিখতেন উপসম্পাদকীয়– 'কথা-ইতিকথা'। তাঁর সেই লেখার গদ্যভঙ্গিই ছিলো আলাদা স্বাদের। বিষয়টি অনেকের মনে থাকার কথা।

ভালো খাবারের প্রতি মাহমুদ ভাইয়ের যেমন আগ্রহ ছিলো, আজও সেটা লক্ষ্য করা যায়। তিনি সকল সময় পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত জামা-কাপড় পরতেন। যাকে বলে ধোপদুরস্ত। লেখার জন্য ব্যবহার করতেন ভালো কলম ও ভালো কাগজ। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে সব-সময়ই ছিলেন তিনি খুঁতখুঁতে। বারবার কাটা-ছেঁড়া করতেন। সাত দিন পার হলেও কবিতাটি যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ভালো না লাগতো, ততক্ষণ পর্যন্ত হাত থেকে ছাড়তেন না। তাঁর একটি লেখা নেয়ার জন্য পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকরা চাতকের মতো চেয়ে থাকতেন। সবাইকে তিনি অবশ্য খুশি করতে পারতেন না। লেখার ব্যাপারে খুব কাছ থেকে দেখা মাহমুদ ভাইয়ের এই অভ্যাস। ভালো না লাগলে কিংবা জোর করে তিনি কখনোও লিখতেন না। তাঁর লেখার ধরন ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত।

মাহমুদ ভাই এক বিরল সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। সাহিত্যই তাঁর ভালোবাসা ও বেদনার কেন্দ্রবিন্দু। সাহিত্য ছাড়া আর কোনোও বিষয়ে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিলো না, আশ্চর্যের বিষয়– আজও নেই। এটা কম কথা নয়। একটি জীবন কেবল সাহিত্যের জন্যই বিলিয়ে দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। অনেকেই পারেন না। কেউ কেউ পারেন। তাঁদের সংখ্যা নেহাত নগণ্য। এই নগণ্য তালিকায় মাহমুদ ভাইয়ের নামটি জোরেশোরে উঠে আসে বৈকি!

মাহমুদ ভাই ভ্রমণ করতে খুবই আগ্রহী। সাহিত্য সভা এবং ভ্রমণ–এই দুটোর প্রতি তাঁর আকর্ষণ অনেক বেশি। কাছ থেকেইতো দেখা! যখন যেখান থেকেই সাহিত্য সভার ডাক আসুক না কেন মাহমুদ ভাই সেখানেই হাজির। অনেকটা অবাক লাগে– এখন, এই বয়সেও তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সভায় উপস্থিত হন। তাঁর শারীরিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। বয়সের ভারে অনেকটাই ন্যুব্জ। চোখে প্রায় দেখতেই পান না। কানেও কম শোনেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। একা চলাফেরা করতে পারেন না। তারপরও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আবেগের কোনো কমতি দেখি না। তিনি এখনও সাহিত্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।

আশির দশক বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট। আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্যিক ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত্তিমূল এই দশকে আমাদের অক্লান্ত আন্দোলন ও প্রচেষ্টায় প্রগ্রোথিত হয়। পরবর্তীতে এটা আরও বেগবান হয়। যে কারণে আশির দশকেই বাংলা সাহিত্য এ দেশে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য সুখবর এটাই যে আমাদের সেই আন্দোলনের ফসল আজ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অনেক গভীরে তার শেকড় চলে গেছে। এই আন্দোলনের মাঝেই আমরা মাহমুদ ভাইকে পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম কবি আবদুল মান্নান সৈয়দসহ আরও অনেককেই। কিন্তু মাহমুদ ভাইয়ের উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদের জন্য ছিল এক বিশেষ পাওয়া। তাঁর সেই অবদানের কথা ছোট করে দেখার মতো নয়।

সাহিত্যের পথটি মসৃণ নয়। আগুনের দরিয়া পাড়ি দিতে হয় একজন কবিকে। চারপাশে ভক্ত থাকলেও সহযোগিতার মানুষের বড় আকাল। পৃষ্ঠপোষক বলতে তেমন কিছু নেই। এমনই এক কঠিন পথ পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকেই ছিটকে পড়েন। সাহিত্যের গণ্ডিতে তাঁদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈষয়িক হিসাব-নিকাশের বাইরে সাহিত্যের অবস্থান। এ বড় কঠিন ও দুর্গম পথ। এ পথ পাড়ি দেয়া চাট্টিখানিক কথা নয়। সাহিত্যের পথ বড় দীর্ঘ ও অনিঃশেষ। এ পথে সবাই হাঁটতে পারেন না। গন্তব্যে পৌঁছানোতো আরও কঠিন কাজ। এখানে আশাহতের বেদনা আছে, না পাওয়ার বেদনা আছে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার যন্ত্রণা আছে, পাওয়া-না পাওয়ার কষ্ট আছে, স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা আছে, রাষ্ট্র, সমাজ ও সংসারের উৎপীড়ন আছে। এমনই সাত সমুদ্র তের নদী সাঁতরে সাফল্যের কিনারায় ওঠা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়।

কিন্তু শ্লাঘার বিষয় বটে, মাহমুদ ভাই সাহিত্যের সুদীর্ঘ অমসৃণ পথ ও বাঁক পেরিয়ে সেটা পেরেছেন। বলা যায় তিনি অজেয়কে জয় করেছেন। সাহিত্যের হিমালয় চূড়া স্পর্শ করেছেন। এখানেই তাঁর সাফল্য।

এখনতো তাঁর জন্য উচ্চারণ করি–

তোমার জন্য উড়িয়ে দিলাম
ভালোবাসার বাদাম
সালাম, তোমায় সালাম।

মাহমুদ ভাইয়ের ৭৭তম জন্ম বার্ষিকীতে দোয়া করি তাঁর সুস্বাস্থ্যের ও দীর্ঘায়ুর। কামনা করি তিনি আমাদের সাহিত্যের জমিনে আরও ফসল ফলিয়ে যাবেন। আমাদের সাহিত্যের জমিনটাকে আরও উর্বর করবেন।
আল্লাহপাক তাঁকে কবুল করুন।

২৪.৬.২০১২

www.pathagar.org

মুগ্ধতার সুতোয় বোনা

হামিদুল ইসলাম

একটা মানুষকেই আমি প্রচণ্ড হিংসে করি। সে আল মাহমুদ।

– কেন? সে কি ছবি আঁকে নাকি? নাকি তোমার মতো বয়স? সেতো বয়সের ভারে জবুথবু। তারপরও তাকে হিংসা!

– হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যই তো তাকে হিংসা! ত্রিকালদর্শী বুড়োর মতো চেহারা অথচ এখনো কৈশোরের আবেগ ধরে রাখে। এমন এমন কথা বলে, যেন তারুণ্যের তর্ক বেঁধে যাবে। এমন এমন শব্দ উচ্চারণ করবে যেন মনে হয় আমিও এমন উচ্চারণ করতাম। কিন্তু 'কেমনে বুড়ো পারলো সেটা জানতে'।

আগেভাগেই বলে দিয়ে একটা বিজয়ীর হাসি ছুড়ে দেবে। তারপর দু'আঙুলের মুদ্রা চেলে বলবে, হামিদ, একটা সিগ্রেট হবে! তারপর কোথায় হারিয়ে যায় হিংসা! প্রচণ্ড আড্ডায় ডুবে যাই আমরা, সময় পেরিয়ে যায় সময়ের মতো। আমরা বুদ হয়ে থাকি। সালভেদর দালির পেন্টিং-এর মতো বিমূঢ় সময় গলে পড়ে! সেটা আমাদের অফিসের বারান্দা, ছাদে কিংবা শহরের কোনো ব্যস্ত সড়কই হোক অথবা ঢাকা থেকে বহুদূরের কোনো মফস্বল শহরের সার্কিট হাউসই হোক। সেখানে আয়োজকদের পক্ষে দায়িত্ব পালনরত তরুণ সদস্যরা সম্ভ্রমে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতো। এক সময় তারাও ভিড়ে যায় আড্ডায়।

কিশোরকালে যখন ছোট্ট মফস্বল শহরে আমরা সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করতাম তেমিন হঠাৎ এক বিকেলে বন্ধু আতা সরকার হাজির। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

– দেখেছেন হামিদ ভাই, শামসুর রাহমানের সাম্প্রতিক কবিতার বই। নামটা দেখেছেন! 'রৌদ্র করোটিতে'। কী অসম্ভব আধুনিক নাম। মুগ্ধতায় তার চোখ চিক্ চিক্ করছিল। আমারও মুগ্ধ হবার পালা। যতটুকু না কবিতার গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা তার চাইতে কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে তার মার্জিত, স্মার্ট আর আধুনিক নামটা দেখে সম্ভ্রমের সাথে বইতে হাত বুলাই। এর পরই হাতে আসে 'সোনালী কাবিন; আল মাহমুদের কবিতার বই। নামটা কি আধুনিক না গ্রামীণ! নাকি শহরে ঢুকে বুটিক হাউসের শোরুমে গ্রামীণ পোশাকের মতো অসম্ভব আধুনিক হয়ে গেছে।

এবার আর শুধু নাম আর গ্রন্থ দেখে মুগ্ধতা নয়। ভেতরে প্রবেশ করা গেল। এ যে অন্য পৃথিবী! অন্য রকম উচ্চারণ!

সেই যে আল মাহমুদের সাথে কবিতার গাঙে ভেসে ভেসে হারিয়ে যাওয়া– আর ফিরে আসা হয়নি। এরপর যে সব নাম এলো 'মিথ্যাবাদী রাখাল', 'আরব্য রজনীর বাজহাঁস', 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো', 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', 'বখতিয়ারের ঘোড়া' এগুলো কী? শুধু নামগুলোই যে পাগল করে দেয়। আমি দীর্ঘদিন তার এমন মোহময় সুন্দর নামের মাঝে বুদ হয়ে ছিলাম। বন্ধুরা, কোনো নামের বিপাকে পড়লে কিংবা উদ্ভট কোনো নামে কবিতার বই বের করতে চাইলে তাকে সবিনয়ে বলতাম– 'মাহমুদ ভাইয়ের কাছে চলে যাও। একটা সুন্দর নাম নিয়ে এসো।'

আর কবিও উদার হাতে তৎক্ষণাৎ একটা নাম দিয়ে দিতেন যার কোনো বিকল্প ছিল না।

এই 'বুড়ো' আবার গদ্যে হাত লাগালেন। কবিতার বইকে হার মানানো গল্প সঙ্কলনের নাম 'পানকৌড়ির রক্ত'। আমি বইটি নিয়ে বিমূঢ় হয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে ছিলাম। শব্দ যে মানুষকে এমন সম্মোহিত করতে পারে এতো সেই উচ্চারণ। কালো ক্যানভাসে টকটকে লাল দিয়ে অনেক ছবি এঁকেছি, প্রচ্ছদ করেছি। কিন্তু কুচকুচে কালো পানকৌড়ির টকটকে লাল রক্ত! আমার মাথা ঝিম ঝিম করছিল। এই হলেন কবি আল মাহমুদ।

বাচ্চাদের নিয়ে তার ছড়া তো সে আর এক তুলকালাম কাণ্ড। এখানে তার কাব্যগুণের কোনো ফিরিস্তি দিতে বসিনি। শুধু মুগ্ধতার কথা বলছি। এখনো আমি কোনো প্রিয় কিশোর-কিশোরীকে ছড়ার বই উপহার দিতে গেলে আল মাহমুদকেই সবার আগে রাখি। কারণ তিনি 'ছড়া আঁকেন'- লেখেন না। যেভাবে তিনি ফেরেস্তাদের দিয়ে চাঁদের বাটি উল্টে দিয়ে জ্যোৎস্না বিলান, দ্বিতীয়জন কে পারবে এমন কাজ করতে? তো হিংসা তাকে করবো নাতো কাকে করবো?

www.pathagar.org

আব্বাকে যেমন দেখেছি

শামীমা আক্তার বকুল

কবির সঙ্গে লেখিকা

অনেক দিন থেকেই আমার শ্বশুরকে নিয়ে কিছু লেখার জন্য কিশোরকণ্ঠ থেকে বলা হচ্ছিল। আবদুল বাতেন যোগাযোগ করছিল আমার সাথে। সময়-সুযোগ না হওয়ার কারণে লেখা হচ্ছে না। তার তাগাদায় আজ আব্বাকে নিয়ে কিছু লিখতে চেষ্টা করছি। আমার শ্বশুর কবি আল মাহমুদ। যাকে আমি এই সংসারে আসার পর থেকে আব্বা বলে ডাকি। আমি এই কবির সংসারের বড় বউ হিসেবে প্রথমে বলবো আমার আব্বা খুবই ভাল মানুষ। সরল, সহজ এবং সৎ। তার মতো মানুষ হয় না। আমার বিয়ে হয়েছে ৮৮ সালে, প্রায় ২৪ বছর আমি এই সংসারে। আমি ছোট সংসারের মেয়ে হলেও আমার বিয়ে হয়েছে বড় পরিবারে। আমার শাশুড়ি আমাকে তার বড় ছেলের জন্য পছন্দ করে নিয়ে এসেছেন। প্রথমে অসুবিধা হলেও ধীরে ধীরে এই সংসারের সাথে নিবিড়ভাবে আপন হয়ে যাই। এক সময় আমরা সবাই এক হয়ে বসে গল্প করতাম আর আব্বা শুয়ে থাকতেন আর শুনতেন। এখন আলাদা হলেও বিশেষ দিনে বিশেষ করে আব্বার জন্মদিনে এক সাথে সবাই আব্বাকে নিয়ে গল্প করি। আব্বার জন্মদিনগুলো খুবই আনন্দময় হতো যখন আমার শাশুড়ি জীবিত ছিলেন। আমরা চার বউ আর তিন ননদকে শাশুড়ি বলতেন তোমরা নতুন শাড়ি কাপড় পর, আজ অনেক মেহমান আসবে। রাতে সবাই এক সাথে বসে আব্বার সাথে গল্প করতাম। কিন্তু আম্মা মারা যাওয়ার পর সে রকম আর হয়ে ওঠে না। সবাই আসে, আগের মতো জমে ওঠে না। আম্মা মারা যাওয়ার পর আব্বা খুবই একা হয়ে যান। যখন তিনি একা বসে থাকেন, আমাকে ডেকে বলেন, 'বউ মা তুমি আমার কাছে একটু বস, তোমার সাথে একটু কথা বলি।' আব্বা তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক ভাই আছেন, তার গল্প করেন। আম্মা কেমন ছিলেন, ভাই-ভাতিজা, গ্রামের কাঁচারাস্তা, তিতাস নদী কিভাবে বেড়ে উঠেছেন ইত্যাদি কথাগুলো বলেন। আব্বার বোন নাহার, জাহানারা, লাইলী আর আম্মার কথা বেশি বলেন। আব্বার মায়ের হাতের রান্না, বাবার ফকির মিসকিন, দরবেশদের খাওয়ানোর গল্প আমার সাথে করেন। আব্বার বেশির ভাগ সময় কাটে টিভি দেখে ও পত্রিকা পড়ে। আমি মাঝে মধ্যে একটু হাঁটাই, হাঁটলে আব্বার ভালো লাগে। লেখালেখি করেন যখন তার মন ভালো থাকে। আমাকে বলেন, অথবা আমার ছেলেদের বললে তারা লেখে।

আব্বাকে নিয়ে এই দীর্ঘ ২৪ বছরে আমার অনেক স্মৃতিই আছে। সবই এক একটা ইতিহাস। মজার ব্যাপার হলো, আব্বা যখন সফর থেকে আসতেন, আমাদের সবার জন্য এটা-ওটা নিয়ে আসতেন। কিন্তু এনে সব কিছু আম্মার হাতে দিয়ে বলতেন, সব তোমার, তুমি যাকে ইচ্ছা দিয়ে দাও। আর আম্মা সবাইকে নিয়ে বসে পড়তেন আর ভাগ করে দিতেন। আব্বা বসে বসে হাসতেন। আম্মার প্রতি আব্বার ভালোবাসা ছিল গভীর। তাই তিনি এটা করতেন। খাদিজাকে আব্বা অনেক পছন্দ করেন। আমার সাথে খাদিজা আব্বার সবসময় দেখাশোনা করে। আব্বাকে এটা ওটা বলে হাসায় আর আব্বা পরে আমার কাছে বলে হাসেন।

আমি আব্বার বড় ছেলের বউ হিসেবে অনেক গর্ববোধ করি এই জন্য যে, আমি শুধুই তার বউ মা-ই নই, আমি যেন তার মেয়ে। কবিরা নাকি একটু উদাসীন হন। কিন্তু আমার আব্বার ক্ষেত্রে সেটা কখনোই দেখিনি। তিনি যেমন মহান কবি, তেমনি মহান শ্বশুর। আগে আমাকে তিনি বকুল নামে ডাকতেন। এখন বউ মা বউ মা বলে ডাকেন। আমি কখনোই আব্বার সেবা করতে গিয়ে বিরক্তি বোধ করি না। বরং আনন্দ আর সম্মান বোধ করি। আব্বার শরীর একেবারে বেশি খারাপ না হলে নামাজ পড়া ছাড়েন না। ভাত খেতে চান না, পোলাও, কোরমা, রোস্ট আব্বার প্রিয় খাবার। তাছাড়া সব জিনিসই আব্বা খান। আসলে আম্মাই ছিলেন আব্বার চালিকাশক্তি। আম্মার স্মৃতি মনে হলেই আব্বার একাকীত্ব বোধ করেন তখন আমি, আমার স্বামী, আমার দুই সন্তান আর কাজের মেয়ে খাদিজা আব্বার পাশে থাকি। এতে আব্বা কিছুটা স্মৃতি ভুলে থাকেন। আমি আমার এই লেখার মাধ্যমে আব্বার পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুরাগী সবার কাছে আব্বার জন্য দোয়া চাই। আর আমি মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আব্বার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে আনন্দের সাথে আব্বার কাছে রাখেন।

লেখিকা : কবির বড় ছেলের স্ত্রী

www.pathagar.org

চির সবুজের কবি

জুবায়ের হুসাইন

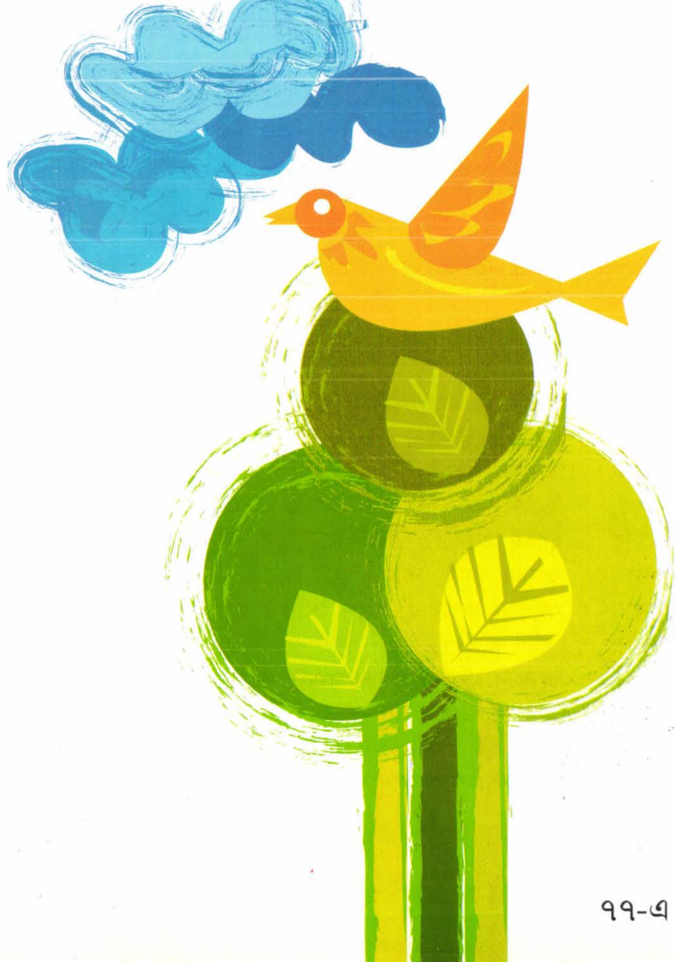

স্কুলে পড়াকালীন একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে একটি প্রশ্ন ছিল এরকম : চিরসবুজের কবি বলা হয় কাকে? এখনকার মতো উত্তর বাছাই করার চারটি অপশন সেখানে ছিল না। কিভাবে জানি না, উত্তরটা আমার জানাই ছিল। লিখে দিয়েছিলাম নামটা।

স্কুলের বাংলা পাঠ্যবইয়ে একটা কবিতা ছিল। কবিতাটা এখনও আমার মুখস্থ–

"নারকেলের ঐ লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল
ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠাণ্ডা ও গোলগাল।
ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর
ঘুমন্ত এই মস্ত শহর কাঁপছিল থরথর।..."

কী চমৎকার, কী জীবন্ত রূপকল্প! পড়তে পড়তে মনে হতো আমাকে নিয়েই যেন ওই কবিতাটা লেখা হয়েছে। কতবার হারিয়ে গেছি তার মাঝে!

বোধকরি তখন থেকেই কবি আল মাহমুদের প্রতি একটা দুর্বলতা আমার অন্তরে লালিত হতে থাকে। তাকে স্বচক্ষে দেখার প্রবল ইচ্ছা পুষতে থাকি মনের মধ্যে। অবশেষে ২০০৯ সালে এসে যায় সেই সুযোগ। কিশোরকণ্ঠের তখন আমি সহকারী সম্পাদক। ফেব্রুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কবি আল মাহমুদকে বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত এই শিশু-কিশোর মাসিকটির উপদেষ্টা করা হয়। খুশির খবরটা তাঁকে জানাতেই তাঁর গুলশানের বাসায় গেলাম আমি ও আব্দুর রহমান ভাই। সঙ্গে ছিলেন গোলাম মোস্তফা ভাই। কবির জন্য কিছু গিফটও সঙ্গে নিয়েছিলাম আমরা। সেদিনের সেই পুলক ও অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমনটি হয়েছিল আমার প্রথম লেখা ছাপা হওয়ার পর। ১৯৯৪ সালে আমার গল্প ছাপা হওয়া পত্রিকাটা হাতে নিয়ে আমি কেবল বিছানার ওপর গড়াগড়ি খেয়েছি। কাউকে সে খুশির খবর জানাতেও পারিনি। আনন্দে আমার চোখে সেদিন পানি এসে গিয়েছিল। আল মাহমুদকে স্বচক্ষে দেখার পর সে রাতটাও আমার অনুরূপ কেটেছিল।

আমি মূলত গল্প এবং উপন্যাস লিখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কিন্তু এক সময় প্রচুর ছড়া ও কবিতাও লিখেছি। দৈনিক সংগ্রামে একবার আমার দুটো কবিতা একসাথে ছাপা হয়েছিল। গল্প ও উপন্যাস বেশি লিখলেও আমি কবিতার ভীষণ ভক্ত। তাই আল মাহমুদের কোনো কবিতা বা তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু লিখলে আমি দ্রুত সেটা পড়ে শেষ করে ফেলি। বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ-এর প্রতিটা পর্ব আমি একাধিকবার করে পড়েছি।

www.pathagar.org

বহুবার গিয়েছি কবির কাছে। গিয়েছি লেখা আনতে অথবা কোনো শুভদিনে বিশেষ শুভেচ্ছা জানাতে। ২০০৯ সালের ১১ জুলাই প্রথমবারের মতো কবির জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর সৌভাগ্য অর্জন করি। এখনও প্রয়োজন হলে ছুটে যাই চিরসবুজের এই কবির বাসায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হলো। নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানে সমাজতন্ত্র কথাটা রাখা হলেও সমাজবাদী বিধান চালু করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত শাসকগোষ্ঠী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা মুসলিম মানস দ্বারা প্রভাবিত। মুসলিম মানসের বিপরীতে নতুন কোনো বিধান প্রয়োগ করলে তাকে দেশের জনগণ পাকিস্তানিদের মতোই বর্জন করতে পারে। কিন্তু সমাজবাদীরা এটা মেনে নিতে পারলেন না। তারা তাদের লেখনী, চলচ্চিত্র, গান ও নাটকের মাধ্যমে দাড়ি-টুপি পরিহিত মুসলিম ইমামদের খলনায়ক হিসেবে দাঁড় করায়। কারণ তারা অনুধাবন করেছে মুসলিম মানসনির্ভর এই সমাজ তাদের গ্রহণ করবে না। যে সমাজ প্রবলভাবে আল্লাহকে গ্রহণ করেছে সেখানে নিধর্মবাদ সমৃদ্ধ সমাজবাদীদের কোনো স্থান নেই। এই অনুধাবন বা এই সমাজ বিশ্লেষণ কবি আল মাহমুদ অবলোকন করেন। তিনি নিগূঢ়ভাবে পাঠ করলেন এই সমাজের প্রতিটি জেনেটিক কোড। পাঠ করলেন বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের সহজ সরল মানুষের মুখের মানচিত্র। তখনই তিনি সমাজবাদী চিন্তা থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে বাংলাদেশের সমাজ নির্ভর চিন্তা ও মুসলিম মানসকে গ্রহণ করে বললেন– "আমি কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে/ধ্বংসের ওপর রেখে আসা আল্লাহর আদেশ/বুকে তুলে নিলাম।"

আল মাহমুদ অনুধাবন করতে পেরেছেন, যে ধর্মাবলম্বীরা মক্তবেই পাঠের প্রথম ছবক তুলে দেয় শিশুর মুখে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে একজন সমাজমনস্ক মানুষ কখনো সমাজের বিপরীত ধারায় থাকতে পারে না। তাই তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। প্রত্যাবর্তন করতে হয় মাটির কাছে, মানুষের কাছে, ধর্মের কাছে।

একটু পর কবির 'সোনালী কাবিন' পড়ে শেষ করেছি। এতে কবির সমাজবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। খরস্রোতা নদীতে কিভাবে হাল ধরতে হয়, নদীর বাঁকে বাঁকে কিভাবে নৌকা চালাতে হয় তা ভালোভাবেই করায়ত্ত করেছেন কবি আল মাহমুদ। তেমনি সমাজের বাঁকগুলোতেও তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। অলীককল্পনার পেছনে ছুটে ছুটে সমাজবাদীদের মতো ক্লান্ত না হয়ে তিনি ধর্মনির্ভর সমাজ গঠনে ছুটিয়ে দিয়েছেন 'বখতিয়ারের ঘোড়া'।

কবিরা সাধারণত অন্য কবিদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকেন। বিশেষ করে জীবিত কবিরা তো পরস্পরকে সহ্য করতে পারেন না একদম। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আল মাহমুদ যত বেশি আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর সমবয়সী কবিদের দ্বারা, ততোধিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ কবিদের দ্বারা। আল মাহমুদের কবিতার ভক্ত কেবল কবিতার সাধারণ পাঠকেরাই নয়, ভক্ত তরুণ প্রজন্মের কবিরাও। সত্য যে, তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যই তাঁর দিকে পাঠককে টেনেছে বেশি, তবে নতুন প্রজন্মের কবিদের মাঝে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অন্য কোনো কারণ যদি থেকে থাকে, তাহলো তরুণ কবিদের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও তাদের সঙ্গে গড়ে ওঠা তার হৃদিক সম্পর্ক।

তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের সানন্দে স্বীকৃতি দিতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেননি। আড়ালে আবডালে থাকা প্রচারবিমুখ প্রকৃত কবিদের নিয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে এবং বহুল প্রচারিত জাতীয় পত্রিকাসমূহে তা ছাপিয়ে দিয়ে সারাদেশে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছেন তিনি নিজস্ব স্টাইলে। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও অনেক কায়ক্লেশ স্বীকার করে নব্বইয়ের দশকের কয়েকশ' কবির কবিতা পাঠ করে তাঁদের মধ্য থেকে মৌলিক কবিদের খুঁজে বের করে তাদের কবিতার উদ্ধৃতিসহ যে মূল্যবান লেখা উপহার দিয়েছেন পাঠকদেরকে, তা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

কবি আল মাহমুদের মতো আমিও উঠে এসেছি এক মফস্বল শহর থেকে। সারাজীবন ডাকেই লেখা পাঠিয়ে এসেছি পত্র-পত্রিকায়। সম্পাদক লেখা ছেপেছেন, এর লেখককে দেখতে পাননি কখনও। এখন অবশ্য অনেকেই দেখে থাকেন। মূলত নিভৃতে থাকতেই আমি পছন্দ করি।

কিশোরকণ্ঠে তখন কবির কৈশোর স্মৃতি ছাপা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে 'সেই দিনগুলি' শিরোনামে। এরই মাঝে তাকে নিঃসঙ্গ করে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন তাঁর প্রিয় সহধর্মিণী নাদিরা বেগম। ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যার জন্য কৈশোর স্মৃতি আনতে গেলে স্বভাবতই কবির কাছে তাঁর সহধর্মিণী সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি একটি কবিতার মাধ্যমে সেটা চমৎকারভাবে তুলে ধরলেন–

"তোমার কথা পড়ছে মনে এই একাকী
আকাশ বাতাস লুটায় যেথায় একলা থাকি,
একা আমার জীবন বড় কষ্টে কাটে
কে যেন গো আমার পাশে একলা হাঁটে।

শব্দবিহীন স্তব্ধ বেলা কাটাই একা
ভাবি মনে তোমার সাথে হবেই দেখা।
ঘাড় ফিরিয়ে তাকাই আমি কোথায় তুমি
এই তো সবুজ মাটির গন্ধ মাতৃভূমি।

তুমি ছাড়া সবই কেমন ছন্নছাড়া
তুমি ছাড়া হৃদয় আমার পাগলপারা
তবুতো দিন কাটছে আমার দুঃখ-সুখে
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে কোন্ মুলুকে?"

নবীনরা প্রবীণদের ওপর কাজ করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আল মাহমুদ এসবের তোয়াক্কা না করে লেখালেখি করেছেন আমাদের মতো তরুণদের কবিতার ওপরও। তরুণরা যে আজ প্রচুর তাঁর সাহিত্য নিয়ে গবেষণা, পিএইচডি, এমফিল প্রভৃতি করছে এর পেছনে তাঁর তরুণদের মন জয় করে নেয়ার বিষয়টি অবশ্যই কাজ করেছে।

www.pathagar.org

আসাদ বিন হাফিজ
আল মাহমুদ ও তাঁর কবিতার খাতা

তাঁর কবিতার খাতা যেনো রূপময় এক বাংলাদেশ।
পৃষ্ঠা খুললেই দৃষ্টি জুড়ে করে সীমাহীন অথৈ সবুজ।
দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ জুড়ে নৃত্য করে হিল্লোলিত যুবাধান।
রাখালি বাঁশির সুরমগ্ন শ্যামবর্ণ শীতল গ্রাম, ডাকে আয়;
দোয়েল ও দয়িতার সংরাগে শুনি, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো।
তাঁর কবিতার পৃষ্ঠা জুড়ে শুয়ে থাকা মায়াবতী নারীদের
জানি না কি মন্ত্রণা দেয় মিথ্যাবাদী রাখাল। যন্ত্রণা-নীল
একচক্ষু হরিণ শুধু বেদনার্ত বিলাপে মুখর করে মন
কালের কলস ভেঙে নারী খোঁজে সোনালী কাবিন।
লোক-লোকান্তর থেকে ছুটে আসি আমি দূরগামী
প্রহরান্তের পাশ ফেরা রমণীরা কান পেতে শোনে
খটাখট শব্দ তুলে ছুটে আসছে বখতিয়ারের ঘোড়া
ছুটে আসছে পুরুষ সুন্দর; স্বপ্নের অচিন রাজপুত্তুর
উপমহাদেশ তোলপাড় করা গন্ধবণিক।
কবিতার জন্য বহুদূর ছুটতে ছুটতে কবি পার হয় নদী
পার হয় অরণ্য প্রান্তর, রৌদ্রদগ্ধ মরু মুষিকের উপত্যকা
আকুল কণ্ঠে ডাকে, নিশিন্দা নারী কই? আগুনের মেয়ে?
পাখির কাছে ফুলের কাছে তৃষ্ণাকাতর আঁখি তুলে বলে,
কই হৃদয়ের সহোদর কাবিলের বোন?

তারপর পানকৌড়ির রক্ত পান করে ময়ূরীর মুখ হাতে
ডাহুকী প্রান্তর ছুটে যায় কবির আত্মবিশ্বাস। বলে, দেখো
যেভাবে বেড়ে উঠি। দেখো, কবি ও কোলাহলময় আমার
দিনযাপন। দেখো, সৌরভের কাছে পরাজিত হয় না
আল মাহমুদের গল্প কিংবা অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না।
তাঁর কবিতার খাতা যেনো রূপময় এক বাংলাদেশ।
বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখা মেঘেদের উড়াউড়ি।
কবিতার লাইনগুলো ভৈরব ব্রিজ, বেগবান তিতাস নদী
শব্দরা খলবল জিয়ল মাছ আর বহু রঙা মাছরাঙা পাখি।

আল মাহমুদ, সময়ের প্রেমধন্য কবিতার এক অনিন্দ্য যুবরাজ
কবিতা তাঁর মনিপুরী নিপুণ হাতের সুচারু কারুকাজ।

জাকির আবু জাফর
গন্ধময়ী রাজা

বকুল ডালে লুকিয়ে থাকার স্বপ্ন ছিলো তার
স্বপ্ন ছুঁতে হাত বাড়ালো তিতাস নদীর পার
নদীর পারেই রোদ পোহাতেন মেঘের দেশে দেশে
কল্পলোকে উড়াল দিতেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে
হাওয়ার গাড়ি ছুটতো আবার জোসনা রাতের বাড়ি
পরীর পালক পরিয়ে দিতেন সপ্ত আকাশ পাড়ি
কাঁঠালচাপার গন্ধে তাহার মন ছিলো না পাঠে
ইচ্ছে মতোন ছুটে যেতেন নদীর ঘাটে ঘাটে
তার আকাশের জোসনা নামে কর্ণফুলীর জলে
জীবন ভরে ছিলেন তিনি না ঘুমানোর দলে
জলপিপি আর নীল জোনাকি সঙ্গী ছিলো তার
তার জগতে ফুলপাখি আর রোদের অভিসার
পিদিম জ্বলা রাত্রি এনে ঘাসের মাঠে রেখে
ছড়িয়ে দিতেন বনফুলের সুবাস মেখে মেখে
ছন্দফুলের রাজ্যে তিনি গন্ধময়ী রাজা
তার সুবাসে সবার হৃদয় ভীষণ তরতাজা
চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন সবুজ সুখের রেশ
কিন্তু তিনি জানেন এটি বোয়াল মাছের দেশ।

www.pathagar.org

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
নকিব

ফুলেল আকাশ
সেই আকাশে মেঘের সারি তারার বাড়ি
জোসনা খেলে রাতের সাথে
ছি বুড়ি ছাই লুকোচুরি

সেই আকাশে বিমান চলে গোপন সুরে
রকেট চলে আলতো তারা
কালো রোমশ বুকটি ফুঁড়ে

বিজলী নামে মেঘলা রাতে রোদের ঝিলিক বুম!
বুক কাঁপে ফের পথ দেখা যায়
পালায় কারো ঘুম

কেউবা চলে নিজ কবরে শশ্মান ঘাটে
কেউবা ফেরে আঁধার আলোয় বাড়ি
এবং দ্যাখে সোনার কাবিন ঘোড়ায় চলা গাড়ি
নিজকে রেখে দোয়েল ডাকা মাঠে

অবুঝ রাখাল বুঝ ফিরে পায়
সফর করে উপত্যকায়
ভাঙ্গনে তার মন ভাঙেনা
রঙ মাদলে মন রাঙেনা

রঙিন মানুষ বেরঙ পেশায়
সামনে চলে পথের নেশায়
চলার সাথী হাজার পুরুষ নারী
লক্ষ শতক আলোর মিছিল
চলছে সারি সারি

নদীর মতো পাখির মতো
যাচ্ছে যাবে অবিরত
দেখবে সাগর– শখের বাসা বাড়ি
কোটি পুরুষ নারী।

রেদওয়ানুল হক
আল মাহমুদ

জন্ম তোমার মোল্লাবাড়ির মৌড়াইলে
সারা জীবন কাব্য নিয়ে দৌড়াইলে।
কাব্য তোমার অতুল তিয়াস উড়োল মেঘের নাও
স্বপ্নঝরা রোদের ভিতর নূপুর পরা গাঁও
হাজার পাখির রক্তঠোঁটে তাই ওঠে বুদবুদ
সফল তুমি সফল তুমি কবি আল মাহমুদ।

সাইফ মাহদী
দৃষ্টি তোমার

দৃষ্টি তোমার বাংলাদেশের নদ-নদী খাল-বিল
দৃষ্টি তোমার বৃষ্টি-বাদল, আকাশ ভরা নীল
তোমার চোখেই দেখছি এখন, রঙ-বেরঙের পাখি
বিস্মিত হই ঝর্ণা দেখে, ঘোরের মাঝে থাকি

প্রেম-প্রকৃতির হৃদয় তোমার, চিন্তা অসীম জানি
ফুল-পাখিরা তোমায় নিয়ে করছে কানাকানি
কী অপরূপ দৃশ্য আ-হা লেখায় তুলে আনো
অসাধারণ শব্দচয়ন, ভক্ত হৃদয় টানো

তোমার চোখে বৃষ্টি ঝরে? বৃষ্টিতো নয় হীরে
দেখবে কতো বৃষ্টি ঝরে এই তোমাকে ঘিরে
সৃষ্টি তোমার বাংলাভাষায়, এখন সারা বিশ্বে
তোমায় দেখে কারো মনে, নিত্য জাগে ঈর্ষে

তোমার আকাশ থাক তোমারই আমরা বেড়াই ঘুরে
শুনছি তোমার জয়ধ্বনি পাখির সুরে সুরে
দৃষ্টি তোমার ছড়িয়ে আছে এই আমাদের চোখে
আনন্দেরই বৃষ্টি ঝরুক, হাজার করুণ শোকে

প্রভুর কাছে চাইছি দোয়া সুস্থ থাকো তুমি
তোমার চোখে বিশ্ব হাসুক, হাসুক স্বদেশ ভূমি

www.pathagar.org

মো: আবদুল বাতেন

গোধূলি বেলায় কবি

চার দেয়াল আর দুই দরজা
লোহার শিকলে আটকানো বারান্দা
কত সময় থাকা যায় বল!
সাদা কালো দাড়ি ঝুলে পড়া
গালের উপরে তিলের স্পষ্ট ছাপ।
কত বার দেখা যায় বল!
বাংলাদেশের মত ভাঙা, উঁচু-নিচু
চেহারায় অভিমানের পাহাড়।
কলাপাতা যেমন বয়স হলে
নুয়ে পড়ে মাটির টানে
দেহের হাতগুলো তেমনি
নুয়ে পড়েছে ...
বাঁকা লাঙ্গলের মত একাত
নয়তো ওকাত করে পড়ে আছে
শ্বাসযুক্ত দীর্ঘ দেহ।
পরে আছে বর্ণহীন কাভারের উপর
কবির মুহূর্তগুলো উপলব্ধিতে
ধরা পড়ে এক চোখের আলোর মত
হয়তো বুঝতে পারি
হয়তো আবার পারি না।
আবিষ্কারের নেশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি
পলকহীন, দৃষ্টি প্রখর আমার চোখ।
মনে হয় ক্ষণে ক্ষণে মুনাজাত
করে আছে তার হৃদয় ...।
কিছু কথা বলতে গিয়ে বলে না
কম্বল টেনে মাথাগুঁজে দু'হাত তুলে
কখনো স্বর তুলে
'আল্লাহ আমার শারীরিক সামর্থ্য দাও
আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও।'
কখনো পরাজিত সৈনিক যেন শুয়ে আছে
আমি বুঝি না তার হৃদয় গর্বের
আবেগ কাতর প্রার্থনা
শুধু এতোটুক বুঝি গোধূলি বেলায় কবি
তার সাথে প্রার্থনারত হই। এক সাথে
আলাদা ...।
দু'হাত তুলি- হে মালিক ক্ষমা কর
সাহায্য কর ...।
তুমি ছাড়া তো আর কেহ নাই।

জাফর ফিরোজ

বখতিয়ারের ঘোড়ায় চলা কবি

লোক লোকান্তরে ছন্দের ঢেউ তুলে
রাঙাতে পারেন যিনি কালের কলস
সোনালী কাবিনে বাঁধা ময়ূরীর মুখখানি
মায়াবী পর্দা দোলা দুপুর অলস
বখতিয়ারের ঘোড়ায় ছুটে চলা সে কবি
পাখি ও ফুলের কাছে বলে
সৌরভের কাছে পরাজিত গন্ধবণিক
দেশ উপমহাদেশ ছুটে চলে।
আত্মবিশ্বাসে পদ্য গদ্যে ভরা
শূন্যতা মানতে চান না যিনি।
নদীর ভিতরে নদী এঁকে যান নিরবধি
সময়ে সাহসী কলম ধরেন তিনি।
পানকৌড়ির রক্তে দ্রোহ ফুটে ওঠে
আরব্য রজনীর রাজহাঁস ছুটে চলে।

নিশাত তাসনীম স্বস্তী

সেই ছেলেটি

মাহমুদ নামের সেই ছেলেটি
স্বভাবে বড়ই শান্ত
সব সময় ভাবত যে কী
ছিল না তার অন্ত।
কবি কবি ভাব ছিল তার
হয়েই গেল কবি
কবিতার মাঝে উঠতো ফুটে
গ্রাম বাংলার ছবি।
আকাশ বাতাস নদী পাহাড়
দেখত অবাক চোখে
গরিব-দুঃখীর বন্ধু সে যে
সুখে এবং দুঃখে।
মনটা ছিল বড়ই উদার
আকাশের মত বড়
দেশের জন্য করবে কিছু
পণ ছিল তার দৃঢ়।
এমন ছেলে ঘরে ঘরে
থাকতো যদি সবার
দেশটা তখন বদলে যেত
থাকতো না কিছু কবার।

www.pathagar.org

স্মৃতির ফ্রেমে...

১. কিশোরকণ্ঠের নতুন অফিস উদ্বোধন ও দোয়া অনুষ্ঠানে কবি আল মাহমুদ

২. সাহিত্য সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান

৩. ২০০৬ সালে কিশোরকণ্ঠ লেখক সম্মেলন ও সাহিত্য পুরস্কার অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কবি

৪. ২০০৯ সালে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য

৫. কিশোরকণ্ঠের পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা

৬. ২০০৩ সালে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কবি ।

৭. ২০০৪ সালের ইফতার মাহফিলে কবি

www.pathagar.org

১১. ২০০৩ সালে ২য় কিশোরকণ্ঠ লেখক সম্মেলন ও সাহিত্য পুরস্কার অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য

১২. ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় লেখক সম্মেলনে কবি

৮. ইফতার মাহফিলে সভাপতির বক্তব্য

৯. ৭৬তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা

১০. ২০১১ সালে ইফতার মাহফিলে সভাপতির বক্তব্য

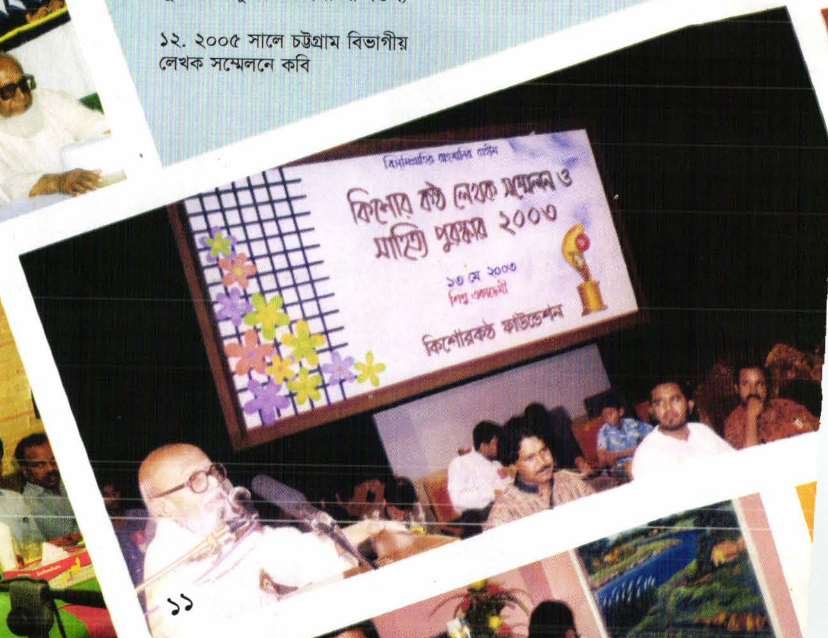

১৩. কিশোরকণ্ঠের প্রীতিভোজে কবি

১৪. সাহিত্য সন্ধ্যায় নিয়মিত উপস্থিত হতেন কবি

www.pathagar.org

১৫. ২০০২ সালে কবি আল মাহমুদকে পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে কিশোরকণ্ঠের সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সূচনা হয়।

১৬. কিশোরকণ্ঠ অফিসে কবি।

১৭. ২০১১ সালে কিশোরকণ্ঠ লেখক সম্মেলন ও সাহিত্য পুরস্কার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি।

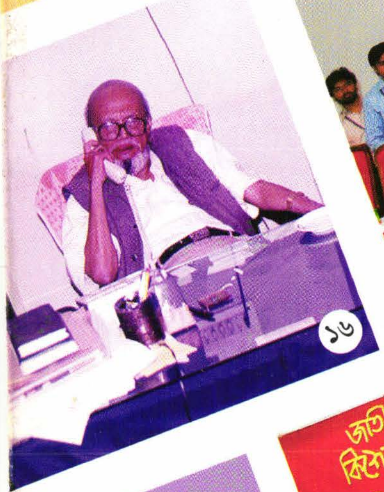

১৮. ২০১০ সালে ইফতার মাহফিলে কবি।

১৯.০৯ জুন ২০১২ প্রথম জাতীয় কিশোরকণ্ঠ পাঠ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতি।

২০. কিশোরকণ্ঠের ইফতার মাহফিলে কবি

২১. কবি আফজাল চৌধুরী স্মরণে দোয়া মাহফিলে আল মাহমুদ।

www.pathagar.org

নতুন কিশোরকণ্ঠ
৫১, ৫১/এ (৭ম তলা), পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৭২৩৬
www.kishorkanthabd.com